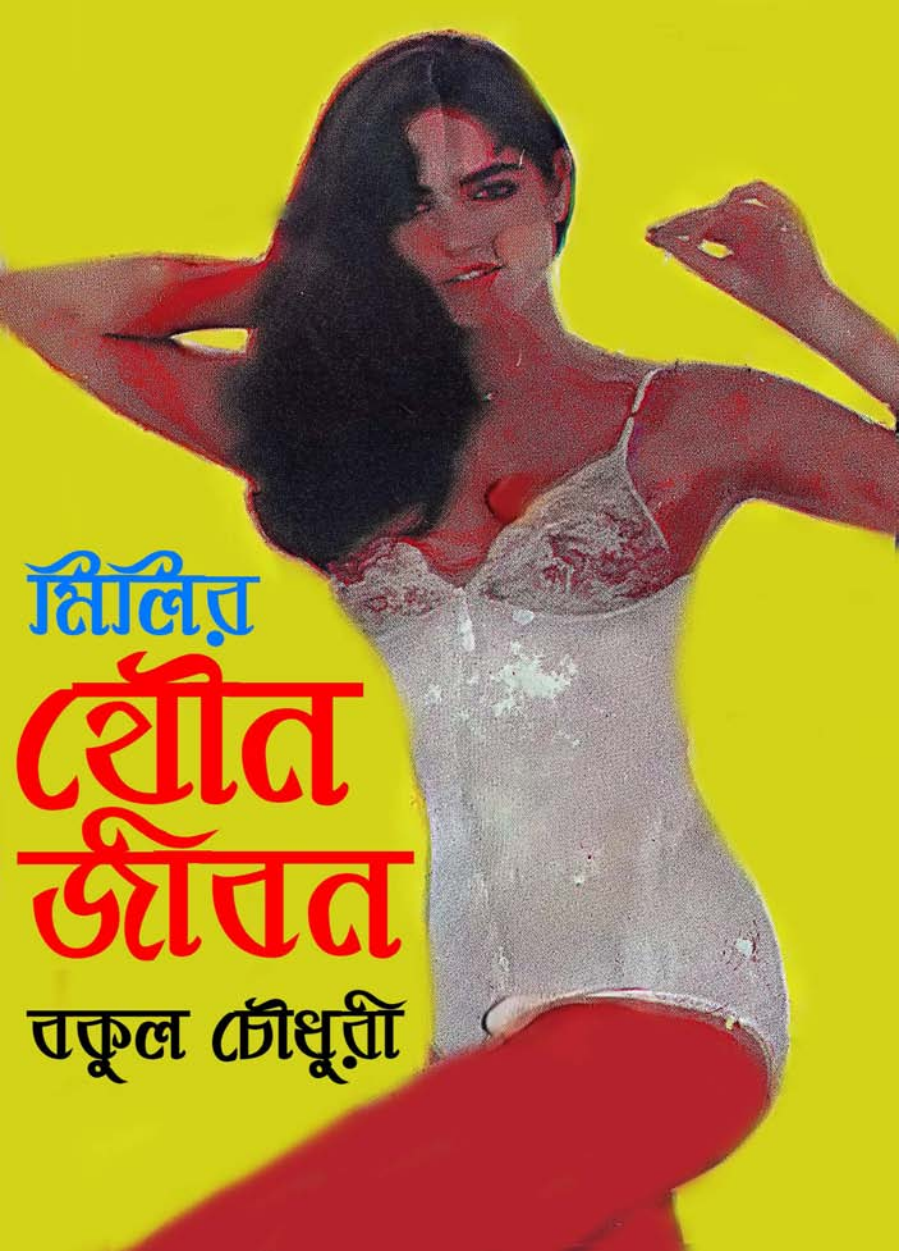

থ্রিলার
যৌন জীবন
বকুল চৌধুরী

মিলির যৌন জীবন

বকুল চৌধুরী

মিলি একজন অসহায় নির্যাতীতা তরুণীর নাম। যার যৌবনের উছলে পড়া মধু চেটে-পুটে খেয়েছে পুরুষ রূপী নর পশু গুলো।

অসহায় মিলি ঘুরে বেরিয়েছে একটু আশ্রয়ের আশায় এখানে ওখানে। আশ্রয় সে পেয়েছে ঠিকই, বিনিময়ে ধর্ষিতা হয়েছে নির্মমভাবে প্রতি জাগায়। খুবলে খুবলে খেয়েছে মিলির ষোল বছরের লালিত যৌবনটি নর পশুর দলেরা। তবু বেঁচে থাকার নিজের—সতীত্বকে রক্ষা করার আপ্রাণ চেষ্টা করছে মিলি।

এই আশ্রয়ের খুঁজে বের হয়েই ধরা পড়লো দুর্ধর্ষ স্মাগলার মিহিরের হাতে। জাল টাকা তৈরীর কারখানা। অবাধ্যতার দরুণ মিহির নিক্ষেপ করলো মিলিকে এক হিংস্র জানোয়ার সিম্পাঞ্জীর কাছে।

না। তারপরও শেষ নয়। সাথী ললিতার তাজা কলিজা রেধে দিল মিহির মিলিকে খাবার জন্যে.....। শ্বাস রুদ্ধকর অত্যাচার আর নির্মমতার পৃথিবীতে ঘুরে আসার নামান্তরই এ বই পড়া।

সুচিত্রা প্রকাশনী
৩৩, জনসন রোড (দোতালা) ঢাকা-১

MILLI'S SEXUAL LIFE

Renewed by

BAKUL CHAWDHURY

মিলির যৌন জীবন

নব রূপায়নে :

বকুল চৌধুরী

পরিবেশনায় :

সুচিন্তা প্রকাশনী

৩৩, জনসন রোড (দোতালা) ঢাকা-১

মিলির যৌন জীবন

একটি রোমাঞ্চকর এ্যাডভেঞ্চার উপন্যাস

প্রকাশনায় ঃ

মোঃ নজরুল ইসলাম

গ্রাম – কবিরপুর

থানা – সাভার

ঢাকা – বাংলাদেশ

প্রথম প্রকাশ ঃ

মে, '৮২ ইং

দ্বিতীয় প্রকাশ ঃ

জানুয়ারী '৮৭

প্রচ্ছদ পরিকল্পনা ঃ

মিঠু

প্রচ্ছদ অঙ্কনে ঃ

সুখেন দাস

বাঁধাইয়ে ঃ

আঃ মালেক এণ্ড কোং

৩/১১ লিয়াকত এভেনিউ

ঢাকা-১

মুদ্রণে ঃ উমা প্রেস

৮/৯ কৈলাস ঘোষ লেন ঢাকা – ১

যা বলতেই হলো

বাবা-মার জন্ম দেয়ার পরও কিছু দায়িত্ব থেকে যায়। যা চলে সুদীর্ঘ ২৫টি বছর। বাবা-মার আদর স্নেহ আর ঐকান্তিক ভালো-বাসায় একটা অবোধ শিশু গড়ে ওঠে একজন সভ্য মানুষ হিসাবে। এই বিচিত্র পৃথিবীতে বিচিত্র ধরনের মানুষের বাস। অথচ প্রতিটি মানুষের গন্তব্য স্থান একই। এবং শেষও হবে একই স্থানে। তবুও একেকজন মানুষ একেক পথে গমন করছে। জীবনকে যারা বিপন্ন করে দিয়েছে — হারিয়েছে জীবনের সকল কিছু। ধ্বংস হয়েছে এ পৃথিবীতে। তাদের নিয়ে বিশ্লেষণ করলে দেখা যায়, প্রায় সবাই বাবা-মার ঐকান্তিক স্নেহ ও ভালোবাসা থেকে বঞ্চিত।

এই ভালোবাসা থেকে বঞ্চিত এক তরুণীর করুণ কাহিনীর চিত্ররূপ এই বইটি। যার প্রতিটি দৃশ্যে রয়েছে রোমাঞ্চকর, অথচ বিষাদময় বেদনা আর যন্ত্রণা। অসহায় সম্বলহীনা এক অভাগির করুন আর্তনাদ।

মেয়েদের পরম সম্পদই হলো তাদের যৌবন। আর এই যৌবনই একদিন মিলির জীবনে হয়ে এলো কাল হয়ে।

নর পিশাচের দল খাবলে খেতে লাগলো তার যৌবন নামের মধুভাণ্ডারটি ঘূর্ণিঝড়ের। ছিন্ন খড়-কুটুর মতোই এদিক ওদিক উড়লো হতভাগী মিলি।

শুধু তাই-ই নয়। আন্তর্জাতিক স্মাগলার-এর হাতে বন্দীনী হলো মিলি একদিন। তারা আটকে রাখলো তাকে জাল টাকা তৈরীর কারখানায়।

এক অন্ধ কোঠায় ফেলে দিলো তাকে অবাধ্য হবার জন্য। হিংস্র দানবের হাতে তুলে দিলো তাকে দলপতি। পশুর মতো খাবলে খেল তার ষোল বছরের যৌবন ভাণ্ডার। এক সময় গ্যাস চেম্বারে নিয়ে যাওয়া হলো মিলিকে। এবারই শেষ। কিন্তু না... ...। এ যাত্রাও বেঁচে গেল মিলি ... ...। কিন্তু কেমন করে ... ... ?

রূপকার

বিঃ দ্রঃ কাহিনীর প্রয়োজনে দ্বিতীয় মুদ্রণ প্রকাশের পূর্বে কিছুটা সংশোধন ও বর্ধন করতে হলো। স্বভাবতই বইটি ১২৮ পৃষ্ঠার স্থলে এসে দাড়াল ১৬০ পৃষ্ঠায়।

চেষ্টা থাকা সত্ত্বেও দাম না বাড়িয়ে উপায় ছিল না। সে কারণে বইটির দাম ৮ টাকার স্থলে ১২ টাকা রাখা হলো।

প্রকাশক

এক

এই যে ডার্লিং একটু শোন—

সাপের মতো ফোঁস করে ওঠে মেয়েটি। মেয়েটি মানে স্কুল গোয়িং একটি ষোড়শী যুবতী। রূপে তার জেল্লা আছে—যৌবন যেন এক ফুটন্ত গোলাপ। জমকালো পোষাক পরে, ঠাঁটে- বাটে যখোন সে স্কুলে যায়, পার্টি ফাংশানে এ্যাটেণ্ড করে, তখন ভ্রমরের দল ওর মধুবনে বেপরোয়া হয়ে, উড়ে বসতে চায়—পান করতে চায় তার গোলাপ বনের এতোদিনের সঞ্চিত মধু।

স্কুলের পথে রোমিও মার্কা এক হিরো রোজ দ্যাখে ওকে। কখনো দ্যাখে রিক্সায় চেপে যাচ্ছে মেয়েটি—কখনো বা পায়ে হেঁটে। একদিন এই যুবকই ওকে একাকী পথে পেয়ে, প্রশ্ন করেছিল,

এই শোন—

থমকে দাঁড়ায় মেয়েটি। অনেকদিনই ওকে এ পথে এসময়ে দাড়িয়ে থাকতে দেখেছে সে। দু'পা এগিয়ে এলো ছেলেটা—বললো, নিশ্চয়ই তোমার নাম মিলি—সেন বাড়ীর মেয়ে—তাই না? সেদিনও মিলি তাকে কাটখোট্টা জবাব দিয়েছিলো,

ঃ রাস্তায় দাঁড়িয়ে যারা মেয়েদের টন্‌টিং করে, শিষ বাজায়—আমি তাদেরকে রীতিমতো ঘৃণা করি—আশা করি, কথাটা মনে থাকবে।

আর একদণ্ডও দাঁড়ায়নি মিলি। রাজাহাঁসের মতো ভারী নিতম্ব

জোড়া দুলিয়ে, হাই হিল জুতোর শব্দের ঝড় তুলে, গট্ গট্ করে চলে গিয়েছিলো। পেছনে যুবকটির একটি বিদ্রূপ মেশানো মন্তব্য শুনে, তার কানদুটো ঝাঁ ঝাঁ করে উঠেছিলো।

ঃ এ্যাতো দেমাগ ভালো নয় সুন্দরী!

কি দুঃসাহসী যুবক সে। আজ আবার একলা পেয়ে, রীতিমতো 'ডালিং' বলে ডাকছে—ফোঁস করে ওঠারই কথা তার। এবারে ধৈর্যের বাঁধ ভাঙ্গার পালা। নিজেই দু-পা এগিয়ে যায়! তার চেহারায় হয়তো অগ্নিবিচ্ছুরিত হচ্ছিলো—যার জন্য ছেলেটার চোখে-মুখে একটু ভড়কে যাওয়া ভাব পরিলক্ষিত হলো। তার কাছে গিয়ে মিলি ভাবলো, কোন কথা বা ওর কথার কোন জবাব দিয়ে লাভ নেই—বরং কষে একটা চড় ওর গালে বসিয়ে দেওয়াটাই সমুচিৎ। কিন্তু না, নিজেকে মুহূর্তের মধ্যে সামলে নেয় মিলি—কি বলতে চায় ও, সেটা প্রথমে শোনা যাক—পরে অপমান অপদস্ত করে ছেড়ে দিলেই চলবে!

ঃ কি নাম তোমার? ভয়ংকর ক্রুদ্ধ হয়ে উঠেছে মিলি। ক্রূড় হাসি তার চোখে মুখে। ভড়কে যাওয়া ভাবটা কাটিয়ে উঠে, ছেলেটি বেশ স্বাভাবিকভাবে বললো,

ঃ আমার নাম সমীর সেন। গৌরী পাড়ায় আর একটা প্রাচীন সেন-বাড়ী আছে, জানো নিশ্চয়ই।

অনেক কষ্টে ক্রোধ সংবরণ করে, দাঁত দাঁতে চেপে মিলি বলে,

ঃ সেনবাড়ীর ঐতিহ্য ও মান সম্মান নিয়ে একটা সেনবাড়ীই কোলকাতায় আছে: আর সেটা গৌরী পাড়ার সেনবাড়ী নয়। ওটা বদ ও বখাটে ছেলেদের আড্ডাবাড়ী।

ঃ তুমি আমাকে কতোটুকু চেনো?

ঃ রাস্তার একটা বখাটে ফিল্ডারকে আর কতোটুকু চিনবো? যা চিনেছি—এটাই ঢের! তোমার বাবা কে, তা আমি জানি না—তবে

তাকে আজ হাতের কাছে পেলে একটা শিক্ষা দিয়ে দিতাম—তোমার জন্য যে উচিৎ শিক্ষাটা প্রাপ্য সেটা সুযোগ পেলে, তোমার-বাবা-কেই দেবো আমি।

যুবকটি এবারে রেগে যায়,

ঃ খবরদার—যা বলার আমাকে বলো। বাপ, বংশমর্যাদায় টিট্‌কেরী দিয়ে কথা বলো না। মেয়েটি মুখ ভেংচে বলে,

বাপের মান, বংশ মর্যাদার বালাই আছে নাকি তোমার?

ধমকে ওঠে সমীর,

ঃ মিলি সেন! মুখ সামলে কথা বলো!

কেনো মুখ সামলে কথা বলবো? তোমার ভয়ে? তোমার মতো একটা পুঁচকে ছেলে দেখে, মিলি সেন ভয় পাবে, এটা ভাবলে কি করে? যাও, এক্ষুণি এই রাস্তা থেকে কেটে পড়ো—নয়তো—

সমীর মিলির কথায় বাধ সাদে। বলে,—

ঃ রাস্তাটা যেন তোমার বাবার তালুকদারী! যাবো না আমি এ রাস্তা থেকে—দেখি কি করতে পারো তুমি?

ঃ পুলিশ ডাকতে বাধ্য হবো আমি। এদিক ওদিক তাকিয়ে মিলি সত্যি সত্যিই একটা চলমান পুলিশকে অদূরে দেখতে পায়। তাকে হাত ইশারায় ডাকে মিলি। সমীর এবারে সত্যিই একটু ঘাবড়ে গেলো। কে জানে, মেয়েদের চক্কর বাবা—হয়তো সে বানোয়াট যাতা কথা বলে, সমীরকে পুলিশ দিয়ে পেঁদিয়ে দেবে—নেহাতই ছ'মাসের হাজত বাস··· দৌড়ে পালায় সমীর। যাবার সময় বলে যায়,—

ঃ একটা কথা মনে রেখ সুন্দরী—যাকে আজ তুমি পুলিশের ভয় দেখিয়ে সরে যেতে বাধ্য করলে—সে যদি তোমাকে সত্যিই ভাল বেসে থাকে—তবে এমনই একটা বিশেষ ক্ষমতা নিয়ে সে তোমার দ্বারে আবার আসবে, তখন পুলিশের কেন, কারো ক্ষমতাই হবে না

সেদিন তাকে ফিরিয়ে দেবার। আর একটা কথা জেনে নাও, ফিল্ডার বা টণ্টিং বয় আমি নই। নেহাৎই তোমাকে দেখে আমার ভালো লেগেছে, তাই তোমাকে ভালোবেসেছি! আমার এ প্রেম যদি সত্য হয়—তবে নিয়তিতে বিশ্বাসী এই আমি বলে যাচ্ছি, একদিন না একদিন তুমি নিশ্চয়ই আমার হবে—একান্তই আমার।

শ্লেষের উক্তি করলো মিলি,—

হুঁ! কতো গেলো রথারথি—শ্যাওড়া তলায় চক্রবর্তী।

ঠিক আছে—সেটা দেখা যাবে পরে। আমি চলি—বাই বাই।

পুলিশকে এগিয়ে আসতে দেখে, ছুটে পালায় সমীর সেন। সেটা দেখে ব্যাঙ্গাত্মক হাসি মিলির সুন্দর ঠোঁটের কোণে বাঁকিয়ে ওঠে। একাকী অস্ফুটে বলে—

হয়েছে—হয়েছে, ঢের হয়েছে। চামাড়ের অভিশাপে কখনো গাই মরেনা। তোর মতো বখাটে ছেলে আর কবে দাপটের ছেলে হবে? আর কবেই বা নাগাল পাবে আমার? যা তোমার হবার—তাতো হয়েই গেছো, পুলিশ দেখে, লেজগুটিয়ে কেমোন ভোঁ দৌড়টা মারলে? যার হবার তার নয়তেই হয়, যার হয়না তার নব্বইতে ও হয় না।

এই উপন্যাসে সমীরের কিছু করার ছিল না! যা করার স্বয়ং বিধাতা পুরুষই তা করলেন। কিছুদিন পরেই চরম ভাগ্য বিপর্যয় শুরু হলো মিলিদের। তাহলে এবারে কাহিনীটা একটু অন্যভাবে ব্যক্ত করি-বিশেষভাবে এই ঘটনার পর থেকে এবং ওদের ভাগ্য বিপর্যয়টা নিয়ে

o o o o

সুন্দর ফুট ফুটে ফুলের মতো দুটি বোন—মিলি আর লিলি। মিলির বয়স ষোল-যৌবনের দুরন্ত আগুন ওর সর্বাঙ্গে ধা ধা করে জ্বলছে—সবকিছু পুড়ে যেন ছারখার করে দেবে। মিলি যেমন

রূপকুমারী তেমনি অহংকারী—এটাই যেন স্বাভাবিক—যার যে দাম সে তা নেবে না কেনো? মিলির আদর্শ ও চিন্তাধারা এটাই। আবার একদিকে যেমোন সে চটুল চঞ্চলা—তেমনি বন্যার জলের মতো কূল-নাশীনী অর্থাৎ উশৃংখলা। লিলি ঠিক তার উল্টো। বেশ শান্ত, ভদ্র, নম্র ও সৎ! মিলি ধর্ম্ম মানেনা আর লিলি ধর্ম্মের কথা শুনলেই বিনীত হয়ে পড়ে।

বংশটা ওদের যথেষ্ট বনেদী। কোলকাতার চিৎপুর রোডের প্রাচীন ও সম্ভ্রান্ত সেনবাড়ীটা চেনেনা এমোন কোনো পুরোনো বাসিন্দা চিৎপুরে নেই। ওদের বাবা ছিলেন ব্রিটিশ কোম্পানীর একটি ফার্মের ম্যানেজার। কিন্তু তাতে কি হবে? ভাগ্যের বিপর্যয় বলে একটা কথা আছে—ভাগ্য যখোন অপ্রসন্ন হতে শুরু করে—তখোন সে পলকা বাঁশের খুঁটি মানেনা। আসলে কথাটা যে কতোবড় সত্য তা প্রমাণিত হলো ওদের বাবা যেদিন সহসা আত্মহত্যা করে বসলো সেদিন। স্বামীর শোক সামলাতে না পেরে ওর মাও বছর পরে এই সদ্য যৌবনে পা দেয়া দুটো মেয়েকে অসহায় অবস্থায় ফেলে রেখে চলে গেলো।

আসল কথাটা অনেকেই জানেনা—তলে তলে বহু টাকা ঋণ হয়ে গিয়েছিলো ওদের বাবা বিদেহী শরৎ সেন! সেইসব ঋণদানকারীরা নানাভাবে তাকে অপদস্ত করতে শুরু করেছিল—যার পরিণাম আত্ম-হত্যা। কিন্তু শরৎ বাবু আত্মহত্যা করেই যে ঋণের হাত থেকে পার পাবে—তাতো নয়। শরৎ সেনের চরম দুর্দিনে ও মৃত্যুতে নিকটজনেরা আগেই দূরে সটকে পড়েছিলো—যা এ সমাজের বসন্তের কোকিলরা বা সুদিনের বান্ধবরা অহরহ করে থাকে।

এদিকে পাওনাদাররা এই দুই যুবতীর অসহায় করুন মুখের দিকে না তাকিয়ে, বাকী সম্বলের ভাগাভাগি এবং অংশটা কে কিভাবে লুটে-পুটে খাবে—তাই নিয়ে ব্যস্ত হয়ে পড়লো। প্রাচীন ঐতিহ্যবাহী চিৎপুর

রোডের সেনবাড়ীটা অন্যের দখলে চলে গেলো। প্রাচীন বাড়ীটার ইঁট, কড়ি বড়গা ও প্লাষ্টারে শাবল গাঁইতি পড়তে লাগলো—ভেঙ্গে চুড়ে নতুন আর্কিটেক্‌চারে আধুনিক সুপার মার্কেটগুলো গড়ে উঠতে লাগলো—আর তারই আড়ালে চিরদিনের মতো ধুয়ে মুছে গেলো সেনবাড়ীর সকল আভিজাত্য—অবলুপ্ত হলো ঐতিহ্য চিরতরে।

এবারে ওদের কি হবে? দুঃসহ দুর্ভাগ্যের টানা পোড়নে, অন্তহীন আর্থিক বিপর্যয়ের মুখে ওরা দু'জন ভেঙ্গে মুষড়ে পড়লো। দেহের সামান্যতম অলংকারের পয়সা শেষ হয়ে যাবার পর নিতান্তই দিশেহারা হয়ে পড়লো ওরা। আত্মীয়-স্বজন সবাই এ অবস্থায় মুখ ঢাকা দিলো। দুঃখ যন্ত্রনা আর অনাহারে কেটে গেল কয়েকটা মাস। এক সময় শোক দুঃখের শেষ অনুভূতিটা মিলি তার অন্তর থেকে ধুয়েমুছে ফেললো-ওর আদর্শ হলো, ইট ড্রিঙ্ক এ্যাণ্ডবি মেরী—অর্থাৎ হাসো খাও স্ফূর্তি করো। মিলির যৌবন-সুষমা এবারে যেনো পদ্ম কোড়কের মতো একে একে খুলতে লাগলো! রঙ্গ জেল্লা ফুটে উঠলো শতোগুনে—এই ভরা যৌবনে মিলি আবার দ্বীগুণ উৎসাহে উশৃংখল পথে পা বাড়ালো।

তারো কিছুদিন পরে ওরা যৌবনের তাড়নায় মহানগরী কোলকাতার জনারন্যে চিরতরে মিশে গেলো। হ্যা, জীবন ও যৌবন এমোনই একটা মোহগ্রস্থ গ্রন্থি যে, এর তাগিদ মানুষকে দিশেহারা করে ছাড়ে। মিলি তবু এ ব্যাপারে মোকাবেলা করার মতো মেয়ে। কিন্তু লিলি? ওর কি হবে? ওকে আর কতোদিন বোঝার মতো বয়ে বেড়াবে মিলি? এক দিন অতিকষ্টে অনাহারী মিলি, ওর ছোট বোন লিলিকে নিয়ে হাটতে হাটতে চৌরঙ্গীর মোড়ে এলো। মহানগরী কোলকাতার সান্ধ্যকালীন চৌরঙ্গীর রূপটাই যেনো রাতের কোলকাতার নটী বিলাসিনীর আদি মুখচ্ছবি! আলোক সম্ভার দেখে দেখে নয়ন জুড়ায়—মন ভরে—পেট ভরে না! শুষ্ক কণ্ঠে লিলি বলে,

: আর কোথায় যাবো দিদি? এবার আমাকে বল, তুই কি করতে চাস?

মিলি বললো,

কি করতে বলিস আমাকে? মায়ের সেই বান্ধবী শীলা দেবীর বাড়ীতে যেতে হলে তো আরো দশটা মাইল এভাবে হাটতে হবে—এই ঘোর সন্ধ্যায় সেটা কি করে সম্ভব? ক্লান্ত ও অসুস্থ লিলি এক সময়ে বসে পড়লো। শেষ কয়েকটা নয়া পাই দিয়ে পানি কিনে খেলো। কিন্তু এবারে দু'জন অনেক চিন্তা করেও, এমোন একজনকে মনে করতে পারলো না, পায়ে হেটে যার কাছে টাকা আনতে যাবে ওরা?

লিলি হঠাৎ আবিস্কার করলো, ওর হাতে তখোনও একটা ছোট্ট স্বর্ণাঙ্গুরী রয়েছে। সেটা দেখিয়ে সে মিলিকে বললো,—

: দ্যাখ্ দিদি—এটাকে সম্বল করে কিছু হয় কিনা।

বিপাকে পড়লে হাতিকেও চামচিকের লাথি খেতে হয়—অতএব, সাধা জিনিষের আধাদাম—তাও ভেজাল সন্দেহে কিনতে ইতস্ততঃ করা এক আধুনিক ধনাঢ্যের কন্যা যেনো স্রেফ কৃপা করার জন্যই ঐ স্বর্ণাঙ্গুরীয়ের বিনিময়ে তার প্রেমিকের কাছ থেকে পনেরোটা টাকা ওদের হাতে তুলে দিয়ে বললো,—

তোমরা হয়তো সেই ঠকবাজ দলের লোক নও—তাই দিলাম!

দু'বোন একটা হোটেলে ঢুকে অনেকদিন পর পেট পুরে খাবার খেল। মিলচার্জ মিটিয়ে হাতে যা থাকলো তা দিয়ে শুধুমাত্র ওদের সেই শীলা মাসীর বাসায় যাবার ট্রাম ভাড়াই রইলো। এরপর ওরা সেই শীলা দেবীর বাসার উদ্দেশ্যে ট্রামে চেপে বসলো। রাত তখোন পোনে আটটা বাজে!

দুই

ট্রামে বসে লিলি মিলিকে বলছিলো,—

: এবার কি হবেরে দিদি? মিলি বললো,

: দেখা যাক কি হয়? শীলা মাসী মায়ের প্রাণের প্রাণ ছিলো, সে কি আর ফিরিয়ে দিতে পারবে?

: কিন্তু আমি ভাবছি অন্য কথা—লিলি বলে। ট্রামের জানালা থেকে উদাস দৃষ্টিটা ঘুরিয়ে আনে সে ছোট বোনের মুখের ওপর। বলে,—

: কি কথারে লীলা? (আদর করে ওকে এ নামেই ডাকে মিলি)

: ভাবছি এই অনাশ্রিত অবস্থায় ক দিন আমরা টিকতে পারবো? পেটে ভাত না থাক—আশ্রয় তো দরকার। যৌবনে মেয়েদের সবচে বড় প্রয়োজন আশ্রয়—দেহের নিরাপত্তা।

: তাতো ঠিকই—

: দেখলি তো দিদি দিজের চোখে, ঐ মাতাল লোকটা আমাদের নির্জনে পেয়ে, কিভাবে গাড়ী থামিয়ে, তোর হাত ধরে টানা হেঁচড়া শুরু করে দিলো? ভাগ্যিস পুলিশটা এই পথে এদিকেই আসছিলো। নয়তো—

থাক লিলি ওসব কথা।

: না, আমি বলছি, এ যাত্রা তো ভগবানই রক্ষা করলো—

: ভগবান? শ্লেষের হাসি মিলির কণ্ঠে, কোথায় থাকে ভগবান? কে সে? ঠিকানা কি তার?

মিলি সক্ষেদে বলে ওঠে,

: এই সব অলুক্ষণে কথা কি তুই এখনো বলে বেড়াবি!

নেই—ভগবান নেই—থাকলেও ও ব্যাটা বধির হয়ে গেছে। বুঝলি আমার কথা।

কথায় কথায় বেনিয়াপুকুরে ট্রাম এসে থামলো। ষ্টপেজ থেকে মাত্র একুশ কিলোমিটার দূরে দুধের মতো সাদা বাংলো ওর সেই মাসীর। সানন্দে এগিয়ে গেলো দু'বোন। গেটের কাছে আসতেই একটা বাঘের মতো লালচে বুলটেরিয়ার ওদের সামনে প্রায় ঝাঁপিয়ে পড়লো। চিৎকার করে মিলিকে আঁকড়ে ধরলো লিলি। আশ্চর্য, হিন্দুস্থানী পেট মোটা দারোয়ানটা এ দৃশ্য দেখে হেসে খুন—তার হাতে এই বাঘা কুকুরটার শেকল—তবু ওরা ভয় পেয়ে যেনো বোকামী করেছে—তাই হাসছে সে। কুকুরটা কিন্তু তখোনও বিশাল লালা ঝরা জিব বের করে ওদের দেহ শুকে চলেছে। প্রায় কাঁদো কাঁদো সুরে লিলি বললো,

দারোয়ান ভাইয়া—জরা মেহেরবানী করকে উসকো হটাও।

শিখ দারোয়ানটা খুব মজা পেলো। এক একবার কুকুরটাকে লেলিয়ে দিচ্ছে—আবার টেনে টেনে মজা করছে—খেলার নেশায় পেয়ে বসেছে তাকে। একান্তই প্রিয় কুকুরের অবিশ্রান্ত ডাকাডাকিতে উপরের চিলেকোঠা থেকে খট্ খট্ করে হাইহিল জুতোর শব্দ তুলে, তর তর করে যে নেমে এলো নীচে—ফুলেপূর্ণ সবুজ লনের বুক চেরা পথ বেয়ে 'টমি' 'টমি' ডাকতে ডাকতে এগিয়ে এলো—তার গাউন, বব চুলের ষ্টাইল, মাথার এ্যানামেল রিবন ও দেহের রঙ দেখে বোঝার উপায় ছিলো না যে সে একজন বাঙ্গালী তরুণী। উর্দ্ধশ্বাসে ছুটে এলো গেটে,

: কি হয়েছে রামা সিং—

রামা সিং নামের দারোয়ান ওদের দেখিয়ে বললো,

: দুটো লাড়কী এত্না জওয়ানী লোক, ভিখ মাঙতে আয়া—ইস্-লিয়ে জরাছা মজাক উড়াতা হ্যায়—

ও !

গেট ধরে বিদেশিনীর মতো সেই তরুণী দাঁড়ালো।

মিলি বললো,

আমরা ভিখারিণী নই। মিসেস শীলা দেবীর বাংলো নয় এটা ?

বাঙ্গালী মেয়ে হয়েও সে ইংরেজী বোলে বললো,—

ইয়েস—ইয়েস রাইট ইয়্যু আর—দিস ইজ মিসেস শীলা ভট্টাকি ঘর হ্যায়। তুমকো কেয়া চাহিয়ে বাতাও ?

: আমরা ভেতরে যেতে চাই—শীলা মাসীর সঙ্গে জরুরী আলাপ আছে।

এবার খাস বাংলায় মেয়েটি বলে,—

: যে আলাপই থাক—এখোন উনি কারু সঙ্গে এ্যাপোয়েন্টমেণ্টে রাজী হবেন না।

মিলির কণ্ঠে বিনয়ের আর্তি ঝরে পড়ে,

: আপনি গিয়ে দয়া করে বলুন—তার এক বান্ধবীর মেয়ে এসেছে—চিৎপুরে থাকতো।

মেয়েটি ভ্রূকোচকায়।

কি বললে ? চিৎপুর রোডে মাম্মির গার্লে ফ্রেণ্ড। ও, নো নো—ওল্ড টাউনে ওর কোনো বান্ধবীই নেই—তোমরা ভুল করছো।

মেয়েটির বয়স মিলির থেকেও কম হবে। এদের দু'বোনের বেশ-বাশ ও চেহারা এই দুদিনে মলিন হয়েছে বটে কিন্তু তাই বলে এইসব তুই তোগারী সম্বোধনটা বড্ড খারাপ লাগলো। লিলি ছোট করে বললো,

: দিদি ওকে মায়ের নামধাম জানিয়ে সব খুলে বল—কাজ হবে।

মিলি ভাবলো, প্রস্তাবটা মন্দ নয়। সে যতো সংক্ষেপে সম্ভব, ওদের দুঃখের কাহিনীটা ওকে বুঝিয়ে বললো। কিন্তু কাহিনীটা শেষ করে উঠতে পারলো না। এর আগেই ঘিয়ে রঙের একটা ল্যাটেষ্ট মডেল

জাগুয়ার গাড়ী এসে ওদের দেহ প্রায় ঘেষে দাঁড়াল—একটুর জন্য ধাক্কা খায়নি মিলি! শীলা মাসীর বর সোমন্তবাবুকে গাড়ী থেকে নামতে দেখেই চিনে ফেললো মিলি। কিন্তু এতো রাশভারী লোকের সঙ্গে কথা বলার সাহস তার হলো না। গেট পেরিয়ে যাবার সময় কৃপা করেই যেনো সোমন্ত বাবু দারোয়ানকে শুধালেন, ওদের পরিচয়। দারোয়ানের জবাবটা শুনে ওরা দুঃখ পেলো। সে বললো,

ঃ কাহিকা বুড়াহি লেড়কী—পহেলা সমাজে ভিখ মাঙ্গণে আয়া।

সব কথা না শুনে, সোমন্তবাবু মেয়েকে আদর করে, কি বলে ভেতরের দিকে চলে গেলেন। দারোয়ান ফিরে এসে বললো,

ভাগো তুমলোগ অভি-অভি নেহিতো মুছিবৎমে গিরেগা—

অর্থাৎ এক্ষুণি ভেগে যাও, নয়তো বিপদ কাঁধে এসে ভর করবে। মেয়েটি তখোন একই গাড়ীতে আসা এক নব্য ফিট্ ফাট্ যুবককে নিয়ে রসালাপ ও ঢলাঢলিতে মত্ত। ছেলেটার হাতে একটা টেনিস র‍্যাকেড। মেয়েটা দারোয়ানকে হিন্দিতে দুটো চেয়ার, পানির বোতল, কফির টাস্ক ও একটা চেয়ার লনে আনবার হুকুম দিলো। মিলি বললো,

ঃ আমাদের কথাটা একটু দয়া করে শীলা দেবীর কানে দেবার ব্যবস্থা করুন।

মেয়েটি সদয় হয়ে, দারোয়ানকে সেটাও বলে আসতে বললো। মেয়েটি যখোন দারোয়ানের সঙ্গে কথা বলছে ঠিক তখোন ঐ যুবকের লালসাভরা দুটো চোখ যেনো দুটো বোমকে লেহন ও জরীপ করে গেলো।

o o o o

লনের ষ্ট্যাণ্ড লাইট জ্বলে উঠলো। যুবতী ও সদ্যাগত যুবক—টেনিস কোর্টে খেলায় মেতে উঠলো। খেলার চেয়ে রঙ্গ ও ঢলাঢলিটাই যেনো জমে উঠেছে উভয় পক্ষের মাঝে। মাঝে মাঝে বল নিয়ে যুবতী

ছুটছে – পেছনে ছুটছে যুবক ! ঝোঁপের আড়ালে যুবকটি জাপটে ধরেছে যুবতীকে – জোরাজুরি করতে গিয়ে কামড়েও দিচ্ছে ওর দেহের এখানে ওখানে !

দারোয়ান নেমে এলো ঠিকই-তবে ব্যাস্ত হয়ে পড়লো লন থেকে বল কুড়াতে। কুকুরটার ডাকে এদিকে আসতেই যেনো তার পূর্বের কথা মনে পড়লো। ওদেরকে বললো,

আভি তো যাও তুম লোগ।

উনি কি বললেন ? মিলি প্রশ্ন করলো।

দারোয়ান হেসে বললো, –

দেখো, চোরী চামারী কা জাগা হিয়া নেহী হ্যায় – ইয়ে হ্যায় খোদ পুলিশ ডি, পি, কো বাংলো ! তুমকো বহুৎ মুছিবৎ গিরেগা – আভি আভি যাও –

ঃ উনি কি বললেন ?

আবারও প্রশ্ন করে মিলি ! দারোয়ান রেগে ওঠে।

ঃ আউর কেয়া বোলোগা উন্‌নে তুমলোগুকি পছন্দতে নেহী ! আভি তুম যা শাকতে !

অর্থাৎ উনি তোমাদের চেনেন না ! !

আকাশ থেকে পড়লো মিলি ও লিলি। অথচ ওদের মনে আছে ছোট বেলাকার সেদিনের কথা, যেদিন অফিসিয়াল কোন দুর্ঘটনায় সোমন্তবাবুর সাময়িকভাবে চাকরী চলে গিয়েছিল – আর শীলা মাসী প্রায়ই আসতো ওদের বাড়ী – মায়ের কাছ থেকে টাকা ধার নিতো। মায়ের কাছে না থাকলেও মিলি লিলির জমানো দু'দশ টাকা নিয়েও মা তার হাতে চুপচাপ তুলে দিতো।

ঃ তুম্‌ কেয়া যাওগী ? নেহী, ডাও মারকে পুলিশ ভেজ দোঙ্গা ?

অর্থাৎ তোমরা কি যাবে? নাকি, ডাণ্ডা মেরে হাকিয়ে পুলিশের হাতে দিতে হবে?

দারোয়ান সত্যি সত্যিই ডাণ্ডা নিয়ে তেড়ে এলো। পেছনে টেনিস কোর্টে ওর ডাক না পড়লে—যে লাঠি সে তুলেছিলো, ঠিক তা মেরে বসতো। একটুক হতাশা, করুণ অভিজ্ঞতা ও অপমান নিয়ে অন্ধকার রাতের বুকে দু'বোন পরম বিস্ময়ে পা বাড়ালো। সত্যিই এ যেনো স্বপ্ন ও কল্পনারও বাইরে, শীলা দেবী তাদেরকে এভাবে প্রত্যাক্ষণ করলো

এখান থেকে প্রত্যাক্ষাত হয়ে ওরা অনেকক্ষণ এলোপাথাড়ি ঘুরলো। রাত বাড়ছে—যে করে হোক এ রাতের জন্য একটা আস্তানা চায় ট্রেনের প্লাটফর্মে টিকেট ছাড়া, বেঞ্চে শুয়ে থাকার তিক্ত ফলাফলটা। সেদিনই ওরা হাড়ে হাড়ে টের পেয়েছে।

একটা বাড়ীর সামনে দিয়ে ক্লান্ত পদক্ষেপে ওরা যখোন যাচ্ছিলো ঠিক তখন একটা দামী কালো ইম্পালা গাড়ী থেকে এক ভদ্রলোক নেমে যাচ্ছিলেন। ওদেরকে এই নির্জন পথে এভাবে উদাসভাবে হাটতে দেখে প্রশ্ন করে,—

ঃ কোথা যাবে তোমরা?

ওরা কিছুক্ষন চুপ রইলো। ক্লান্তস্বরে মিলি বললো,

এই রাতের জন্য একটু আশ্রয় চাই। আমরা খুবই বিপদগ্রস্ত। দেবেন একটু ঠাঁই? শুধুমাত্র আজ রাতের জন্যই—সূর্য উঠার আগেই চলে যাবো আমরা। ভদ্রলোক কিভেবে, অনেকক্ষন ওদেরকে দেখেনিয়ে বললো,

ঠিক আছে—এসো আমার সঙ্গে।

মিলি কিছুটা স্বাভাবিক থাকলেও লিলির কাছে এই লোকটার রক্তাভ চোখ আর চাহনীর রকম সকম দেখে ভালো ঠেকলো না।

কই এসো—

গেট খুলে দাঁড়ায় ভদ্রলোক। মিলি এগিয়ে যায়—বলে,

কিরে লীলা, দাঁড়িয়ে রইলি কেনো? আয়—

লিলি তবু ঠাঁয় দাঁড়িয়ে আছে। দূরের গীর্জার পেটা ঘণ্টিতে রাত দশটার সংকেতধ্বনী শোনা গেলো। মিলি রেগে উঠলো,

মামদোবাজীর সময় এটা নয় লীলা।

আমি যাবোনা।

মিলি লীলার হাত ধরে টানে। বলে,

কি, যাবিনা তুই?

ঃ না। স্পষ্ট জবাব দেয় লীলা। বলে, কেনো দিদি, তুমি কি কচ্চি খুকী—কিছুই বোঝ না?

মিলির কণ্ঠে এবার ঝাঁঝ। বলে,

সবই বুঝি আমি—কিন্তু কি করবো? যা হয় হবে—যতোটুকু সম্ভব দু'জনা মিলে আত্মরক্ষা করবো। বাইরের দশটা কুকুরকে এ দেহটা না খাইয়ে বাধ্য হলে একজনকে তবু খাওয়ানো ভাল।

ঃ দিদি!

আমি চললাম—তুই তোর ন্যাকামো নিয়েই থাক।

লোকটার সঙ্গে ভেতরে ঢুকে গেলো মিলি। মিনিটখানেক পরে ফিরে এলো—কিন্তু লিলিকে পেলোনা। এজন্য কোনো দুঃখও হলো না তার। বিড় বিড় করে শুধু বললো,

ঃ যাকগে চুলোয়—মরুকগে—আমার কি? ফের ভেতরে লোকটার দামী ড্রয়িংরুমে ফিরে গেলো মিলি। দু'চার কথার পর, ওর দুঃখের কাহিনীটা একে একে বলে গেলো,

o o o o

মিলির দুঃখের কাহিনী শুনে ওর দেহের ওপর বার বার চোখ বুলিয়ে ভদ্রলোক ওকে কাছে টেনে নিল। ঠোঁটে চুমো দিয়ে বললো,—বলো, কি কাজ তুমি করতে পার?

মিলি তার বুকের ওপর থেকে প্রৌঢ় লোকটির হাতটা নামিয়ে এক দৌড়ে রাস্তায় এসে নামল। কিন্তু বাড়ী ফেরার উপায় আর এখন নেই। তার বাবা বাড়ীটি বন্ধক রেখেছে এক মদখোর ব্যবসায়ীর কাছে। নীলামে সে তাদের বাড়ীটা কিনে নিয়েছিল কয়েকদিন আগে। বাড়ীটা দখল নিয়ে নিয়েছে আজই সকালে।

অগত্যা উত্তর কোলকাতার এক বস্তিতে ঘর ভাড়া নিল সে। সামান্য ভাড়া। তার কাছে যা পুঁজি আছে, এখনও কয়েকটা দিন চলবে বলে মনে হয়। কিন্তু তারপর? তারপর কি হবে।

তবে তার আগেই মিলি একদিন মরিয়া হয়ে শহরে এক নামী ধনী ব্যক্তি বিজন রায়ের বাড়ীতে গিয়ে হাজির হল। সে শুনেছিল ভদ্রলোক নাকি ইণ্ডাষ্ট্রিয়ালিষ্ট, তাঁর অনেকগুলো ফ্যাকটি আছে, আছে অফিস। নিশ্চয়ই তিনি তার একটা কাজের ব্যবস্থা করে দেবেন।

মিলি তাঁকে তার দুঃখ দুর্দশার কথা সব খুলে বলল।

সব শুনে মিঃ রায় জিজ্ঞেস করলেন,—তুমি কি সৎ জীবন কাটিয়েছ?

তা অসৎ হলে কি এমন কষ্টে পড়তাম?

কিন্তু কথা হচ্ছে প্রতিদানে তোমার কাছ থেকে কিছু না পেলে কেন খামখা কেউ তোমাকে সাহায্য করতে যাবে বল?

আমার দেওয়ার তো কিছু নেই।

কেন নেই! তোমার দেওয়ার মত অনেক কিছুই আছে। যাই, হোক তোমার মত অল্প বয়সের মেয়ে আমার বাড়ীতে-কাজ করতে পারবে না। তাই আমি আবার বলছি, তুমি কেবল পুরুষ খুশি করতে পার, তাদের আনন্দ দিতে পার। এমন একজন কারুর কাছে যাও, যে তোমাকে রাখবে। আর একটা কথা তোমাকে বলে রাখি, আজকের পৃথিবীতে সতীত্বের কোনো মূল্য নেই। সতীত্বের তুমি যথেষ্ট মূল্য দিতে পারো, কিন্তু তাতে তোমার পেট ভরবে না। তুমি যদি আমাকে

কিছু দাও, আমিও তোমাকে সাহায্য করতে পারি। নয়তো যাও এখান থেকে, মিথ্যে আমার সময় নষ্ট করো না।

মিলি ফিরে এসে তার বাড়ীওয়ালিকে ঘটনাটা বলতেই সে মুখ বিকৃত করে বলল,—তুমি একটা আস্ত গাধা। এমন অপূর্ব সুযোগ পেয়ে তুমি ছেড়ে দিলে? ছিঃ ছিঃ শুনতেও ঘৃণা লাগছে। না বাছা, তুমি তোমার এমন সতীপনা নিয়ে থাকলে আমার ঘর ভাড়া কখনই দিতে পারবেনা। তার চেয়ে এখনই তুমি এখান থেকে দূর হও! এই আমার শেষ কথা বলে দিচ্ছি।

তাই এক রকম বাধ্য হয়েই সে আবার গেল মিঃ রায়ের কাছে। মিঃ রায় একা ছিলেন। গম্ভীর মুখে জিজ্ঞেস করলেন, কেন তুমি আবার এসেছ?

মিঃ রায়ের পা দুটো জড়িয়ে ধরে মিলি ডুকরে কেঁদে উঠল আপনি আমাকে দয়া করুন, একটু আশ্রয় দিন, কোথাও আমার যাবার জায়গা নেই। কিন্তু তাই বলে যা আমার পরম পবিত্র তা যেন আমার কাছ থেকে নেবেন না!

মিঃ রায় হাসলেন, সেই সঙ্গে রাগলেনও। পেটে ভাত নেই, সতীত্ব দেখাতে এসেছ! দু'হাত দিয়ে তাকে মাটি থেকে টেনে তুললেন খাটের ওপর। তারপর, আস্তে আস্তে মিলির নরম দেহের ওপর ভারী দেহটা হুমড়ি খেয়ে পড়ল। তার ফ্রকের ওপরই তাকে ধর্ষণ করতে লাগলেন তিনি।

ওদিকে মিলি সমানে ওঁর সঙ্গে ধস্তাধস্তি করে চলেছে, সঙ্গে কাঁদছেও। কখনও বা সে মিঃ রায়ের বুকে ঘুষি মারছে।

এমন জেদী মেয়ে মিঃ রায় জীবনে কখনো দেখেননি। তাঁর কামনা জেগে উঠতেই মিলিয়ে গেল। তিনি ওকে ধাক্কা দিয়ে সরিয়ে দিলেন।

যাও. আজ কিছুই হল না। কাল মন ঠিক করে এসো কিছু দেব।

মিলি ছাড়া পেয়ে যেন হাতে স্বর্গ পেল। মুহূর্তে ঘর থেকে উধাও হয়ে গেল।

পরদিন সে আর সেখানে গেল না। বাড়ীওয়ালীকে বলল, ঘর ভাড়ার বদলে সে তার দাসীর কাজ করবে। বাড়ীওয়ালী তাকে প্রায় সারাদিনই কাজের মধ্যে ডুবিয়ে রাখল।

তোমার জন্যে একটা কাজ আমি ঠিক করেছি, বাড়ীওয়ালি এক দিন তাকে বলল,—মিঃ মুখার্জী লোক ভাল, সুদের কারবারী কিন্তু মনটা তার খুবই ভাল। তাঁর একজন কাজের লোক দরকার। তুমি এখনি তার সঙ্গে দেখা করো।

মিলি সেই মুহূর্তে মিঃ মুখার্জীর বাড়ীর উদ্দেশ্যে ছুটল।

মিঃ মুখার্জীকে পৌঢ়ই বলা চলে, মাথার চুল কাঁচাপাকায় মেশানো। মিলি তাঁর কাছে গেলে তিনি বললেন,—মিলি নামটা আমার পছন্দ নয়, তোমাকে আমি রাধা বলে ডাকব। আর তোমার কাজ হবে ঘরদোর ঝাঁট দেওয়া, ধোয়া, মোছা। দু'খানি ঘর মাত্র আমার। তারপর বিছানা করবে, আমার প্রিয় কুকুরকে দেখবে। রান্নাঘরে আমার স্ত্রীকে সাহায্য করবে। সময় পেলে সেলাই করবে। আমি আলস্য একেবারে পছন্দ করি না, বুঝলে?

মিলি রাজি হয়ে গেল। এতদিন পরে একটা আশ্রয় তবু হল তার।

সপ্তাহখানেক পর মিঃ মুখার্জী তাকে দুটো চাবি দিয়ে বললেন—তিনতলায় আমার এক ভাড়াটে থাকে। হীরে জহরতের ব্যবসা করে সে। ছোট চাবি দিয়ে ঘর খুলে ভেতরে ঢুকবে। বড় চাবিটা দিয়ে সিন্দুক খুলবে, যা পাবে সব নিয়ে আসবে থলিতে ভরে। এইনাও থলি।

মিলি স্তব্ধ, হতবাক। আপনি প্রভু হয়ে চাকরকে চুরি করতে বলছেন? এ ভাবে চললে একদিন তো আপনার জিনিষপত্রও আমি চুরি

করতে পারি।

মিঃ মুখার্জী হেসে উঠলেন। আমি তোমার সততার পরীক্ষা করছিলাম রাধা। আমার বাড়ীতেও তো অনেক টাকা থাকে, তাই তোমাকে যাচাই করে নিলাম।

কয়েকমাস পরে সারাদিন হাড়ভাঙ্গা খাটুনি শেষ করে মিলি তার ঘরে শুতে গিয়েছিলো, হঠাৎ কেবা কারা যেন দরজায় প্রচণ্ড ধাক্কা দিয়ে খুলে ফেলল।

মিঃ মুখার্জী চিৎকার করে বলে উঠলো, ঐ যে ঐ মেয়েটিই চোর। এই ঘরেই কোথাও হয়তো লুকিয়ে রেখেছে আমার হীরে।

আ আমি আপনার হীরে চুরি করেছি? চুকড়ে কেঁদে উঠল মিলি।

পুলিশ তার কোনো কথা শুনল না, হাতকড়া পরিয়ে তাকে থানায় নিয়ে গেল। বিচারে দু'বছর সশ্রম কারাদণ্ড।

জেলেই তার আলাপ হলো মিসেস সুতপা ঘোষালের সঙ্গে। জবরদস্ত স্ত্রীলোক। বয়স তিরিশের বেশী নয়। মিলির সঙ্গে আলাপ করতে গিয়ে সে খুব অন্তরঙ্গতা দেখাল।

মিলি মিথ্যে হীরে চুরির কথা বলতেই মিসেস ঘোষাল তাকে তার দুঃখের জন্যে আন্তরিক সহানুভূতি জানাল। একদিন সন্ধ্যার সময় মিসেস ঘোষাল তাঁকে একটা গোপন খবর দিতে গিয়ে বলল, রাত্রে সে যেন জেগে থাকে। মিসেস ঘোষাল এক নিষিদ্ধ রাজনৈতিক দলের সদস্যা ছিল। তার সেই দলের লোকেরা জেলে আগুন ধরিয়ে দেবে। আর সেই গোলমালের মধ্যে তারা পালাবে। অবশ্য কিছু বন্দী মারা যাবে। কিন্তু কি আর করা যাবে? মিসেস ঘোষাল আর মিলি সেদিন রাত্রে সেই হট্‌গোলের মধ্যে জেল থেকে পালিয়ে গেল।

সেই রাত্রে তারা বেহাল ঠাকুর পুকুর ছাড়িয়ে ডায়মণ্ডহারবার রোডের কাছে এক জঙ্গলাকীর্ণ নির্জন জায়গায় এসে পৌঁছল। সেখানে

একটা পরিত্যক্ত বাড়ী পড়েছিল অনেকদিন থেকে। কয়েকজন মস্তান প্রকৃতির যুবক তাদের অভিনন্দন জানিয়ে ভেতরে আসতে বলল। ঘরের ভেতর হারিকেন জ্বলছিল মিটমিট করে। এলোমেলো ভাবে ঘরের চারিদিকে জিনিষপত্র ছড়ান ছিল।

দেখ রাধা, মিসেস ঘোষাল কতকটা হুকুমের মত করে তাকে বলল,

—তুমি এখন মুক্ত, স্বাধীন, যা খুশি তাই করতে পারো। কিন্তু আমার কথা শোন, তোমার ঐ সাজপনা তোমাকে অবশ্যই ছাড়তে হবে। সৎ সাজতে গিয়ে তো ফাঁসির মঞ্চ থেকে কোন রকমে বেঁচে গেছ। বয়স অল্প, সুন্দর চেহারা তোমার। তুমি তোমার ঐ সাবেকী বাতিক ছাড়লে আমি জোর গলায় বলতে পারি, দু'দিনেই তোমার ভাগ্য ফিরে যাবে।

মিসেস ঘোষাল, একটু চোখ রাঙ্গিয়ে বললো মিলি আপনাকে অজস্র ধন্য-বাদ। আপনি আমার প্রাণ বাচিয়েছেন ঠিক' কিন্তু আপনার প্রস্তাব মেনে নেওয়া আমার পক্ষে অসম্ভব। আমার পবিত্রতাই একমাত্র সম্বল। ঠিক এই মুহূর্তে আমি সেটা হারাতে চাই না।

পাশ থেকে একজন বলে উঠল, কি ফিসফিস করছ তোমরা? ব্যাপার কি বল তো।

ও চলে যেতে চায়। বলল মিসেস ঘোষাল।

বটে। চলে যেতে চায়? দীর্ঘ বলিষ্ঠ চেহারার যুবকটি মদের গ্লাস রেখে উঠে দাঁড়াল। এরেই বলে বেঈমান। অতঃপর সে মিলির সামনে এসে বলল—দেখ হে সুন্দরী, যেতে পার, কিন্তু একটা শর্তে। মিসেস ঘোষাল ওকে বুঝিয়ে বলল, পাড়ে ও শুধু মারই খাবে, না কি,—

বলুন। মিসেস ঘোষাল। এখন কি করতে হবে আমাকে।

তুমি আমাদের একজন হবে তো।

হ্যাঁ, হব।

এখন থেকে যা বলব, শুনবে তো?

এবার মিসেস ঘোষাল সেই মারমুখী যুবকটির দিকে ফিরে বলল—তুমি এখন এখান থেকে যেতে পার।

আর এক মস্তান বলল, শোন, আমরা এক সতী পেয়ে গেছি। ঠিক আছে। সহজভাবে আমাদের যখন উনি উপভোগ করতে দেবেন না, তখন একটা মতলব তো বার করতে হবে, যাতে করে আমরা আনন্দ পাই। আমি প্রস্তাব করছি, রাধা আহা কি খাসা নাম। এ যেন বৃন্দাবনের রাধা, আর আমরা সবাই কলির কেষ্ট! এসো আমরা সবাই রাধার বস্ত্রহরণ করে ওকে উলঙ্গ করে দিই। দেহ উপভোগ করতে না দিক, ওর নগ্ন দেহের কিছু তো চোখে দেখতে পাব, কি বল হে সুন্দরী। কুৎসিত দৃষ্টিতে সে তাকাল মিলির দিকে। না, না! মিলি চিৎকার করে উঠল।

যুবকটি উঠে এসে ঠাস করে জোড়ে চড় কষিয়ে দিল ওর গালে। অপর এক মস্তান যুবক জোরে হাত চেপে ধরল, আর একজন তার পরনের পোষাক খুলে নিল।

মিলির পরনে এখন একটা সরু সুতাও অবশিষ্ট রইলো না! সম্পূর্ণ নগ্ন সে এখন। পুরুষ্ট স্তন জোড়া, দুই উরুর সন্ধিস্থলে লাল ত্রিকোণ—সেই সব কামুক পুরুষগুলোকে কামের নেশায় পাগল করে তুলছিল।

ষাড়ের মত যুবকটা তাকে উপুড় করে ফেলল হাটুর ওপর, তারপর হাত দিয়ে চড় মারতে লাগল তার পেছনে। মিলি যত জোড়ে চেঁচায়, ততই জোরে হাত চালায় সে। কি, এখন রাজি তো?

না।

বটে!

ওকে দাঁড় করান হল এবার। তাদের সঙ্গে আরো একজন এসে হাত মেলাল মিলিকে মারার জন্যে। মুখে স্তনে, পেটে, তলপেটে,

কোনো জায়গায় আর বাকী রাখল না সে। যার যেভাবে খুশি ওকে মেরে হাতের সুখ করে নিল।

হঠাৎ একটা গাড়ীর যান্ত্রিক শব্দ শুনে তারা ওকে ছেড়ে দিয়ে বাইরে ছুট দিল। আর সেই ফাঁকে মিলি চট করে জামা পরে ফেলল।

মিসে ঘোষাল অদূরে দাঁড়িয়ে রহস্যময় হাসি হাসছিল তখন। মিলির খুব রাগ হল তার সেই বিশ্রী হাসি দেখে।

ওরা আমাকে এত মারল, অপমান করল, আপনি কিছু বললেন না ওদের ? উল্টো আবার হাসছেন।

মিসেস ঘোষাল মদের গ্লাসে চুমুক দিয়ে হাসল। আমার কি করবার আছে ? বেঁচে গেছ এ যাত্রায়, ওরা যে তোমার ওপর কিছু করেনি, তোমার অনেক সৌভাগ্য।

কয়েক মিনিট পরে সেই মস্তান গুণ্ডা শ্রেণীর যুবক গুলো একটা লোককে ধরে নিয়ে এলো, আগন্তুক ডায়মণ্ডহারবারে গিয়েছিল মাছের ব্যবসা করতে। পথের মাঝে এখানে তার গাড়ীর ওপর তারা হামলা চালায়। তার মানে ওরা ডাকাত ? ডাকাতীও করে ! মিলি কাগজ পড়েছে, আজকাল শিক্ষিত বেকাররা নাকি ডাকাতদের খাতায় নাম লিখিয়েছে। তাহলে সে কি ডাকাতদের পাল্লায় পড়ল ?

ডাকাতরা জেনেছে সেই আগন্তুকের নাম সোমেন হালদার।

সোমেন তাদের মিনতি করে বলল,—তার সঙ্গে যত টাকাকড়ি আছে সব ওরা নিয়ে ওকে ছেড়ে দিক।

অনেক টাকা ! টাকার গরম দেখাচ্ছ ? ডাকাতদের দলপতি তার বুকে বন্দুক ঠেকিয়ে বলল,—কিন্তু বন্ধু, তুমি বেশ ভাল করেই জান, আমরা তোমাকে কিছুতেই ছেড়ে দিতে পারি না।

মিলি সেই দলপতির পায়ের ওপর আছড়ে পড়ল। হুজুর, আমি

ওঁর প্রান ভিক্ষা চাইছি, আপনি দয়া করুন।

কিন্তু তার বিনিময়ে আমি কি চাই জানতো?

জানি। আপনি যা বলবেন তাতেই আমি রাজি।

ঠিক আছে। তোমাকে প্রাণে বাঁচতে দিলাম। তুমি আমাদের সঙ্গে ডাকাতি করবে। আমার বিশ্বাস, তোমার সাহায্যে অনেক খবর আমরা পাব।

ওর রাজি না হয়ে কোনো উপায় ছিল না।

তারপর আবার চলল মদের উৎসব। সোমেন এবং মিলি পাশাপাশি বসে রইল চুপচাপ।

ওরা মদ গিলল প্রচুর। মদে বেহুস হয়ে যে যেখানে পারল কাৎ হয়ে পড়ল। এবং পরক্ষণেই গভীর নিদ্রায় নিমগ্ন হল।

ওদিকে সোমেন কিন্তু জেগেই ছিল। মিলি তার কানের ওপর মুখ রেখে ফিসফিসিয়ে বলল, স্যার, আমিও আপনার মত বন্দিনী। ওরা মদের নেশায় বেহুস, চলুন পালাই, এই সুযোগে।

নিঃশব্দে তারা সেই পোড়া বাড়ীর বাইরে এসে দাঁড়াল। তার পর আর এক মুহূর্তও অপেক্ষা না করে তারা জোরে জোরে প চালাতে লাগল।

খানিকটা পথ হেঁটে এসে মিলি সোমেনের হাতে তার টাকা ভর্তি ব্রিফকেসটা তুলে দিয়ে বলল, এই নিন আপনার টাকা। ওরা যখন ওটা লুকিয়ে রাখছিল, আমি দেখেছিলাম।

সোমেন প্রত্যুত্তরে বলল, তুমি আমার প্রাণ বাঁচালে, আমার টাকা উদ্ধার করলে, আমি তোমার কাছে চিরকৃতজ্ঞ রইলাম।

ওদিকে তখন ভোর হয়ে আসছিল। মিলি হাঁটছিল আগে, আর সোমেন তার পেছনে।

এসপ্ল্যানেড আর কতদূর? প্রশ্ন করলো সোমেন।

আর বেশী দূর নয়। সোমেন তার টাকা ভর্তি ভারী ব্রিফকেসটা দিয়ে পেছন থেকে মিলির মাথায় হঠাৎ জোরে আঘাত করল। মিলি অজ্ঞান হয়ে ঘুরে পড়ল মাটিতে।

ওরা তখন রেসকোর্সের সামনে এসে পড়েছিল। জায়গাটা খুবই নির্জন। ধারে কাছে কোনো মানুষের সাড়া পাওয়া গেল না। ঘোড়া বিহীন রেসকোর্সের মাঠটা ঝিমুচ্ছিল।

সোমেন তার জামা তুলে সেখানেই ঘাসের উপর জ্ঞানহীন মিলির ওপর বলাৎকার করতে শুরু করে দিল। যখন প্রচুর রক্ত পড়তে আরম্ভ করল, তখন ও সেই অত্যাচারী লোকটা পরোয়া করল না। বেপরোয়া ভাবে সে আঘাত করতে থাকল যতক্ষন না সে তার চরম সুখে তৃপ্ত হয়!

তারপর এক সময়ে ওর ফ্রকটা নামিয়ে দিয়ে সোমেন চলল এসপ্ল্যানেডের দিকে।

যখন মিলির জ্ঞান ফিরে এলো সে বুঝতে পারল, যে জিনিষ এতদিন সে "যত্ন করে বাঁচিয়ে এসেছে তাই সে একটু আগেই হারিয়ে বসে আছে।"

ঝর ঝর করে কেঁদে ফেলল মিলি।

ঈশ্বর! কেন তুমি আমাকে বাঁচিয়ে রাখলে? কেন, কেন বাঁচিয়ে রাখলে? কান্নাজড়িত কণ্ঠে বারবার সে বলতে লাগল।

সেই সময় মিলি হঠাৎ অপরিচিত কণ্ঠস্বর শুনে সন্তস্থ হল।

একজন বলছে, এখানেই হোক, নির্জন জায়গা। বাড়ীতে কাকীমার জন্যে একটু আনন্দ করবার ও উপায় নেই। এসো।

আবছায়া অন্ধকার। ভোর হয়ে আসছিল। মিলি উঁকি মেরে দেখল, একজন সম্ভ্রান্ত সুদর্শন যুবক, চব্বিশ পচিশ বছর হবে, তার পরনের

প্যান্ট খুলে ফেলে দুই হাত তার হাটুতে ভর দিয়ে মাটিতে উপুড় হয়ে রইল। আর একজন সম্ভবত তার চাকর, সেও উলঙ্গ, তার পিছনে দাঁড়াল। মিলি চাকরটার কোমড় দুলিয়ে অদ্ভুত নড়াচড়া ছাড়া আর কিছুই দেখতে পেল এসো।

এমন একটা অদ্ভুত ব্যাপার জীবনে কখনো সে দেখেনি। তার বুকের মধ্যে টিপ্ টিপ্ করতে লাগল। তারপর ওরা পোষাক পড়ে ফেলল। চলেই যাচ্ছিল ওরা। হঠাৎ যুবকটি তার ফ্রকের প্রান্তভাগটা দেখে ফেলল। এগিয়ে গিয়ে মিলিকে দেখে সে অন্য লোকটিকে ডাকল, রতন এখানে দেখবে এসো।

মিলি ততক্ষণে উঠে বসেছিল।

লোকটা এগিয়ে গেল। এমন জায়গায় একটি মেয়েকে দেখে সেও অবাক হয়ে গেলো।

এ তাহলে আমাদের কাজ কারবার সব দেখে ফেলেছে।

তাই তো মনে হচ্ছে।

উঠে এসো হে সুন্দরী, দেখি তোমার মুখখানি ভাল করে। 'নিলয় বোস তাকে বলল।' সমস্ত স্ত্রীলোকের ওপরই তার অশেষ ঘৃণা। মিলি তার কাছে এলো।

কি দেখেছ? নিলয় প্রশ্ন করলো।

না, কিছুই তো দেখিনি। আমি ঘুমিয়ে পড়েছিলাম।

রতন, কি করা যায় বল তো? বেঁধে রগড় দেখা যাক।

মিলি কাতর স্বরে অনেক অনুনয় বিনয় করল। ওরা ততক্ষণে নেকটাইর সঙ্গে রুমাল বেঁধে দড়ি তৈরী করে ফেলছে। মিলিকে উপুড় করে ফেললো নিলয় বোস। চাকরটা একটা গাছের সঙ্গে তার পা বেঁধে আর একটা পা টেনে নিয়ে গেল অন্য গাছের কাছে। মিলির মনে হল তার শরীরটা বুঝি চিরে যাবে। প্রায় অজ্ঞান হয়ে যাচ্ছিল

সে। কেবল একটা কঠিন যন্ত্রনায় তার জ্ঞানটা টিকে রইল।

এমনি ভাবে দু'টি গাছে দুই পা বাঁধা। নিলয় অবশেষে তার হাত দু'টোও বেঁধে দিল গাছের সঙ্গে।

দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে হাসতে লাগল তারা। মাঝে মাঝে জুতোর ঠোক্কর দিচ্ছিল ওর পিছনে।

চল, এবার ফেরা যাক। অবশেষে রতন বলল।

ও এভাবে এখানে পড়ে থাকবে?

নিলয় থমকে দাঁড়াল। তারপর কি ভেবে বলল,—ঠিক আছে দড়িটা খুলে দাও।

চাকরটা ওর বাঁধন খুলে দিল।

মিলি ধীরে ধীরে উঠে বসল, তারপর উঠে দাড়াল। গাল ভর্তী চোখের পানি?

নিলয়ের বোধ হয় একটু মায়া হল। সে বলল, আমার কাকিমার একজন দাসী দরকার। যাবে তুমি?

মিলি মাথা নাড়ল। অর্থাৎ সে যাবে।

কিন্তু মনে থাকে যেন, ভাল ভাবে থাকবে।

নিলয় ওকে হাজির করল তার কাকিমার কাছে। বয়স চল্লিশোর্ধ দয়ালু মুখ। মিলিকে প্রথম দেখেই তাঁর পছন্দ হয়ে গেল। মিলিকে তাঁর বাড়ীর কাজে বহাল করলেন সঙ্গে সঙ্গে।

কয়েকমাস বেশ নিরাপদেই কেটে গেল তার। কাজ খুব বেশী নয়। বেশ সুখেই তার দিনগুলি কাটছিল। হঠাৎ একদিন সে আবিষ্কার করল বিকৃত স্বভাব সত্বেও নিলয়কে তার ভালই লাগছে। এক দিন এমন একটা সময় এলো, নিলয়কে মনে মনে সে একান্তভাবেই ভালবেসে ফেলেছে যেন, নিলয় যদি এখন তাকে বলে, প্রাণ

দিতে সে এতটুকু দ্বিধা করবে না,

তবে মরতে নয়, নিলয় একদিন তাকে মারতে বলল।

দেখ রাধা কাকিমা আমার জীবন ভীষন অতিষ্ঠ করে তুলেছে। তাই আমি কি ঠিক করেছি জান?

কি?

কাকিমাকে আমি সরিয়ে ফেলব ঠিক করেছি। তা তুমি আমাকে এ ব্যাপারে সাহায্য করতে পারবে?

মিলি বলল, সে আবার কি কথা? একজন মধ্যবয়স্ক ভদ্রমহিলাকে হত্যা করে কি লাভ বলতে পারেন? তার চেয়ে আপনি বরং আমাকে মেরে ফেলুন।

কিন্তু নিলয় তার কথা শুনতে যাবে কেন?

সে যাই হোক, শেষ পর্যন্ত মিলিকে রাজি হতে হল।

নিলয় তাকে নিজের বুকের মধ্যে টেনে নিল। আবেগে তাকে সে ঘন ঘন চুমো দিতে লাগলো। এবং ফিস্ ফিস্ করে বললো,

তুমি হচ্ছ আমার জীবনে প্রথম নারী যাকে নিজের থেকে চুমো দিলাম।

মিলি লজজায় মুখ লুকোল!

তুমি নিশ্চয়ই জান, নিলয় এবার তার আসল কাজের কথায় এলো। কাকিমা রোজ সকালে এক কাপ ব্লাক কফি খান, তা নিশ্চয়ই তুমি জান। জান তো?

হ্যাঁ, জানি বৈকি!

অত সকালে কাকিমাকে কফি দেয় কে?

ও কাজটা আমাকেই করতে হয়।

তাহলে তো খুব ভালই হল। নিলয় বলল,—এই নাও পাউডার কফির সঙ্গে দু'দিন এই পাউডার মিশিয়ে দেবে। আর তার পুরস্কারস্বরূপ

তোমাকে আমি দু'হাজার টাকা দেব।

মিলি পরদিন সকালে নিলয়ের কাকিমাকে বলল, একটা কথা আপনাকে না বলে পারছি না।

কি রাধা? থামলে কেন বল?

হ্যাঁ, বলব বলেই তো এসেছি। কিন্তু আপনাকে কথা দিতে হবে, যা বলব আপনি তা প্রকাশ করবেন না কখনও। যার সম্বন্ধে আপনাকে বলব, তাকেও নয়। এবং তাকে কোনো শাস্তিও আপনি দিতে পারবেন না।

কাকিমা বেশ সহজেই বুঝতে পারলেন, নিলয়ের কোন অপকীর্তির কথা।

ঠিক আছে। এবার ব্যাপারটা কি বল?

নিলয় আমাকে বিষ দিয়েছে আপনার কফির সঙ্গে মিশিয়ে দেওয়ার জন্যে।

সে কি! কাকিমা আর্তনাদ করে উঠলেন। আমি ওর এমন কি ক্ষতি করেছি? বংশের কুলাঙ্গার, লোচ্চা, হতভাগা! সব সময় আমি ওর সমস্ত অপরাধ ক্ষমা করে ওকে ভাল করবারই চেষ্টা করে এসেছি। আর এদিকে ও আমাকে খুন করার মতলব করছে!

মিলি বিষের শিশিটা কাকিমার হাতে তুলে দিল।

কাকিমা এক টুকরো রুটির সঙ্গে বিষ মিশিয়ে একটা কুকুরকে খেতে দিলেন। কুকুরটি মারা গেল।

নিলয়ের কাকিমা মিসেস প্রতিমা বোস গোপনে চিঠি লিখলেন পুলিশের কাছে। কিন্তু খামে সিলমোহর মারা চিঠি তিনি যে বিশ্বাসী চাকরটির হাতে দিলেন, সে নিলয়ের অন্যতম প্রেমিক।

পুলিশকে লেখা চিঠি পেয়ে তার কেমন সন্দেহ হল। তাই সে

চিঠিটা পুলিশকে না দিয়ে নিয়ে গেল নিলয়ের কাছে।

নিলয় চমকে উঠল। সঙ্গে সঙ্গে চিঠিটা খুলে ফেলল সে! চিঠিটা পড়তে গিয়ে থরথর করে কাঁপতে লাগল। কিন্তু মিলি কাছে আসতেই সে তার রাগটা দমন করল। মিলিকে দেখে আগের মতন তেমনি হাসল।

সন্ধ্যা বেলায় বেড়াতে যাবে? মিলিকে জিজ্ঞেস করলো নিলয়। এ এক আশাতীত ব্যাপার। আনন্দের অতিশয্যে শিউরে উঠলো মিলি। মনে মনে বলতে লাগল, এ আমার কি সৌভাগ্য আজ।

কি ব্যাপার বললে না তো যাবে কি না?

ঃ হ্যাঁ, হ্যাঁ, যাব বৈকি। আপনি যখোন বলছেন,

ঃ বেশ, তাহলে রেসকোর্সের কাছে সেই নির্জন জায়গায় আমার জন্য বিকেল অপেক্ষা করবে। কেমন?

ঃ আচ্ছা, মাথা নুয়ে সম্মতি জানালো মিলি।

সন্ধ্যার আগেই সেখানে গিয়ে হাজির হলো মিলি। চারদিকে একবার তাকালো—কিন্তু নিলয়কে কোথাও দেখতে পাওয়া গেল না। জায়গাটা অত্যন্ত নির্জন অন্ধকার হয়ে আসছিলো তখোন। ভয়ে উত্তেজনায় পায়চারী করতে লাগলো মিলি।

তবে কি নিলয় তার সাথে প্রতারণা করলো? তার বুক এক অজানা ভয়ে কেঁপে কেঁপে উঠলো। আবছায়া অন্ধকারে জায়গাটা ডুবে গেল, ঠিক তখনই নিলয় নামের প্রতিচ্ছায়াকে আসতে দেখা গেল। মিলির কাছে এসে অনুনয়ের সুরে বললো,—

দুঃখিত মিলি! একটু দেরি হয়ে গেল। রাগ করো না লক্ষ্মীটি।

আনন্দে গদগদ হয়ে মিলন বাসরের মধুলগ্নে মিলি বললো,—

না, রাগ করবো কেন। তবে অভিমান করেছিলাম তুমি বুঝি ভুলেই গেছ। তাই একটু ভাবছিলাম মাত্র।

না, না, তা ভুলবো কেন? তুমি রাগ করোনি এটাই স্বস্তি। আমি ভেবেছিলাম তোমার মান ভাঙাতেই আমার হয়তো এরাতটাই চলে যাবে। যাক এখন চলো প্রিয়সী ওদিকে গিয়ে একটু বসা যাক।

পাশাপাশি হেঁটে চলছে প্রেমিক প্রেমিকা। গুন গুন করে গান গেয়ে ভ্রমররাও ওদের মধুবনের স্বপ্নকে আরো প্রজ্বলিত করে দিয়ে গেল। মেঘমুক্ত আকাশ, নির্জন রাত। পাশাপাশি আর কেউ নেই. শুধু ওরা দু'জন। নব্য প্রেমিক জুটি। মিটি মিটি তারাগুলো জলছিল। ধীর মন্থর বাতাসে ধীরে ধীরে শীতল করে দিচ্ছিলো ওদের মনকে। কামনার আতিশয্যে জির জির করে কাপছিলো ওদের যৌবনের অকুল তরী। এক অদ্ভুত সুখ, একটা যন্ত্রণার মতো বার বার মোচড় দিচ্ছে নিলয়ের বুকে। চিনচিন করে ব্যথা হচ্ছে বুকের বাম পাজরে। হঠাৎ রেসকোর্সের পিছন দিকের সেই বড় গাছের ওপর নজর পড়লো নিলয়ের।

নিলয়ের চোখ দু'টো ঝলসে উঠলো। মুখের চোয়াল দুটো অসম্ভব শক্ত হয়ে উঠলো তখোন। মিলির দিকে তাকিয়ে অতি নোংরা স্বরে সে বললো,

কুত্তী, তোর এই জায়গাটার কথা মনে আছে?

নিমিষে সব স্বপ্ন উবে গেল মিলির। উজ্জল আলোর পরিবর্তে ঘোর অন্ধার নেমে এলো মিলির সারা মুখে। সহসা মনে পড়লো সেদিনের কথা, এই সেই গাছ, যে গাছে তাকে বাধা হয়েছিল—গাছে কয়েকটি দড়ি ঝুলতে দেখলো। অন্য একটা গাছে বাঁধা দু'টি হিংস্র ম্যাগাটিফ। কুকুর দু'টি ছটফট করছিলো রাগে উত্তেজনায়। লাল টকটকে একহাত জিহবা বের হয়ে এসেছিলো কুকুর দু'টির মুখ থেকে। ব্যর্থ ও অসহায় মনোরথ নিয়ে আস্তে করে উত্তর দিলো।

: হ্যা—মনে আছে। নিলয় ভিক্ষ স্বরে বললো,

সেদিনই তোমাকে খতম করে ফেলা উচিৎ ছিলো। তা না করে

ভুল করেছি। বিশ্বাসঘাতিনী। আমাকে এক রকম বলে আবার কাকীমাকে বলছ আরেক রকম। তুমি কি ভেবেছ-কাকীমা রেহায় পাবে? না-তা নয়। সে কোনদিনও রেহাই পাবে না। আর তুমিও না। এই মুহূর্তেই তোমার সমস্ত পর্ব শেষ। রাগে গজরাতে গজরাতে নিলয় ওকে টেনে নিয়ে এলো গাছের কাছে। অন্ধকারে কোথা থেকে যেন সেই চাকর বেরিয়ে এলো। দুজনায় মিলে মিলিকে গাছের সাথে শক্ত করে বেধে ফেললো—বাকি শুধু হাত দুটো। বাঘের মতো গর্জে ওঠে নিলয় চাকরকে হুকুম করলো,

ঃ এবার কুকুর দুটোকে ছেড়ে দাও

গলা থেকে শিকল খুলে দিতেই কুকুর দুটি ঝাপিয়ে পড়লো হত ভাগী মিলির উপর। চিৎকার করে উঠল মিলি। প্রতিটি গাছের পাতায় পাতায় প্রতিধ্বনি হয়ে এলো সে চিৎকারের প্রতিধনি। ব্যঙ্গ ভাবে হাসতে লাগলো নিলয় পাশে দাঁড়িয়ে।

কুকুর দুটো হিংস্রের ন্যায় মিলির হাত কামড়াতে লাগলো। রক্তে লাল হয়ে গেল সমস্ত হাত। কিন্তু কি ভেবে নিলয় তার চাকরকে নির্দেশ দিল কুকুর দুটোকে শিকলে বেঁধে রাখতে। কুকুর দু'টোকে আবার শিকলে বেধে গাছে আটকানো না হলো। তা হলে মিলির সমস্ত শরীর কামড়িয়ে ছিন্নভিন্ন করে ফেলতো।

চলে গেল নিলয় কুকুর ও চাকরকে নিয়ে। যাওয়ার সময় সামান্য মায়া লাগলো মিলির জন্য। তাই বাধন খুলে দিয়ে গেল। মিলি গাছতলায় অজ্ঞান হয়ে পরে রইলো সারা রাত।

যখন জ্ঞান ফিরলো তখন প্রায় রাত শেষ। ভোর হবার আগেই হাটতে শুরু করলো মিলি। কিন্তু কোথায় যাবে সে। কে দিবে তাকে মাথা গুজবার ঠাই। টাকার দুনিয়ায় মায়ার মুত্যু তো অনেকদিন আগেই হয়েছে।

উলটা ডাঙ্গার বস্তীতে আর ফিরে যেতে পারবে না সে। সেখানে

ফেরার পথ বন্ধ। দক্ষিণে বালিগঞ্জ কিংবা গরিয়ার দিকে কোথাও আশ্রয়ের যায়গা খুজতে হবে। এছাড়া আর কোনো পথ নেই।

গড়িয়ায় পৌঁছলো সে সকাল দশটা নাগাদ। হেঁটেই এলো সেখানে। বাস ভাড়ার পয়সায় ফুট পাথের চায়ের দোকান থেকে এক ভাড় চা কিনে খেয়েছিল।

গড়িয়ায় রেল ক্রসিংটার ধারেই যে গুমটি ঘর তার পূর্বদিকের ঢালু পথটা ধরে এগুতে লাগলো মিলি। পিপাসায় কণ্ঠনালি শুকিয়ে আসছে তার। ঢালু পথের জন্যই হাটতে পারছে মিলি। আপনা আপনি যেনো নীচু এলাকার ডোম বস্তিটার দিকে এগিয়ে যাচ্ছে ও। পথঘাট, ডেঁরা ছাপড়া মিলে সমস্ত বস্তিটাই অসম্ভব নোংরা। পঁচিশ ত্রিশটা শুকর একটা ডোবার পাকে ঘোঁৎ ঘোঁৎ করছে। দেতো শুকরটি মিলিকে দেখেই যেনো তেড়ে এলো। সাড়ে তিনফিট থেকে চারফুট উঁচু এমোন শুকর সে জীবনে স্যাখেনি। ভয় ভয় করছে ওর। শুকরটা ওর চার দিকে চক্কর মারছে। মিলি ভয়ে মোমবাতির মতো দাঁড়িয়ে রইলো। পায়ের রক্ত মাথায় উঠে এসেছে। ফ্যাস ফেসে কণ্ঠে হাসি শুনতে পেলো মিলি। অদূরে দাঁড়িয়ে, লাল হিন্দুস্থানী ফৌজী পাগড়ি ও লাল পাট্টা কাপড়ের পাঁচ ছ'জন যুবক হাতে তালি দিয়ে হাসছে। মিলির দুরাবস্থা দেখিয়ে দেখিয়ে, একে অন্যের সঙ্গে লগড় করছে। মিলি টুকরো টুকরো জোড়াতালি হিন্দি ভাষায় বললো,

আপলোক হামকো বাঁচাইয়ে! প্রচণ্ড জোরে হেসে উঠলো ওরা আরো মজা দেখার জন্য অসুরদেহী একজন পুচকে সঙ্গীকে বললো,

ঃ চিতু তুহ লাগোয়া ভৈল্!

চিতু নামের ছোকড়াটা এবারে দৌড়ে এসে, শুকরের লেজে চারটে কঠিন পাক মেরে নিজের কান থেকে একটা সুই, লেজে ফুটিয়ে দিলো।

বিকট চিৎকার মেরে লোম খাড়া করলো শূকরটি। শিকারী কুকুরের মতো শূকরটি এবারে মিলির নিতম্ব এবং দুই উরুর সন্ধিস্থলে জোরে জোরে দাঁতের গুতো মারতে লাগলো। এক একটা আঘাতে মনে হচ্ছিলো, জম এসে বুঝি ঈগলের মতো প্রাণপাখীকে থাবা মারছে। ওরা মিলিকে ঘিরে ধরে খুবছে মজা করছে। অসুর দেহীর ইঙ্গিতে চিতু চৌয়াল্লি-ভরা পান পাত্র তুলে দিলো সর্দারের হাতে। ব্যাপারটা ওদের কাছে যখোন দারুণ উপভোগ্য হয়ে উঠেছে আর দেঁতো শূকরটা পূর্ণ নেশায় ক্ষেপে উঠেছে, তখোন মিলির বিশ্বভুবন দুলছে। নিয়াঙ্গ ও নিতম্বের নানান অংশ চিরে চিরে রক্ত নামছে। সাদা পাজামাটা গরম রক্তে লালে লাল। সঙ্গা হারালো মিলি।

মিলির জ্ঞান ফিরে আসতেই পিঠের নীচে প্রচণ্ড ঝাঁকি অনুভব করলো সে। শক্ত বেঞ্চে সে পড়ে আছে। চারদিকে ফিঁকে অন্ধকার। গাছ পালা উঁচু উঁচু মাটির ঢিবি সড়াৎ করে সরে যাচ্ছে পেছনে। মিলি একটা খোলা জীপে মরার মতোন পড়ে আছে। কে বা কারা ওকে কোথা থেকে কোথা নিয়ে যাচ্ছে—কিছুই বুঝবার সাধ্য নেই। এলাকাটা জংলা নির্জন এলাকা। সময় আন্দাজ করতে চেষ্টা করলো ও। এখোন সন্ধ্যে রাত অথবা ভোর রাত হবে। চারদিকে কিচির মিচির বুনো পাখ পাখালীর ডাক। ঠাণ্ডা একটা বাতাস ওর চোখে মুখে ঝাঁপটা দিলো। মিলি নিয়াঙ্গে হাতিয়ে বুঝলো আগের রক্তে ভেঁজা পাজামাটা আর নেই। ওর লম্বার থেকেও আধ বিঘৎ লম্বা একটা ট্রাউজার পরনে। কোথায় যাচ্ছে ও। কারা ওকে নিয়ে ছুটছে। ঘাড়ের নীচে এবং সমস্ত শরীরে ওর চাপ চাপ ব্যথা। তবু ঘাড় ফেরায় মিলি। কি আশ্চর্য, ওর সামনেই এক জুলফি গোঁফ-অলা যুবক পিস্তল হাতে ঝুমছে! দেখলেই বিপদ হতো। ড্রাইভারের পাশে দু'জন লোক। একজন মনে হয় সাধারণ ধুতি চাদর পরিহিত।

সামনে খস্ করে একটা শব্দ হলো। কে যেনো সিগ্রেট জ্বাললো। একজন বললো,

অপারেশনটা মন্দ হলো নারে নারদ। অন্যজনের জবাব,

হ্যা—একঢিলে দুই পাখী।

ঃ মাইরী গোট্ গিয়েছে একখানা। অনেকক্ষণ নিরবতা। প্রথম কণ্ঠ খেকিয়ে উঠলো

শালারা গাড়ীতে উঠলেই তেল জল চেক আপ করবে আর আমার বতোল। এইবেলা কি করি—নেশাটা চাগাড় দিয়ে উঠছে।

ঃ রাখো গুরু—সামনের ভাট্টি থেকে তোমাকে চোলাইতে ডুবিয়ে আনবো,

সেতো এ্যাখোনো ন' দশ মাইল। এসব আর ভাল্লাগেনারে নারদ। এই শালার ব্যাংক রবারিংটা আর আমার পুশছে না।

আমারও না। দ্যাখোনা জানটাকে বাজী রেখে আমরা কিনা করছি—আর এইসব নেতা—ফেতারা দিব্যি আরামে পাহাড় জঙ্গলে বসে মাক্ষী মারছে আর পার্টির নীল নক্সা বানাচ্ছে। আবে শালা তোর পার্টির কথায় আগুন—পায়ের গোড়ালিটা এখনো আমার টন টন করছে।

জীবনটা যে বেঁচে গেছে—এই বেশী।

এবারে ভারী কণ্ঠ শোনা গেলো। হয়তো চাদর পরা লোকটাই কথা বলছে,

একসিড করোনা হাবল। নারদটাও বড্ড বাড় বেড়েছে। তোদেরকে জেল থেকে খালাশ করে আনার আগে কি কণ্ডিশান ছিলো—নারদ খেকিয়ে ওঠে,

ঃ রাখো তোমার জেল। ওখানে শালা ঘুম আর জানটা নষ্ট করতো, জেলের থেকে এই কাজটা বেশী জরুরী।

ঠিক আছে—টার্মটা ফুরালে পি, আর সি, সেকশানের কাজ করবে

তোমরা। তখোন মৌজ করে নাক ডাকিয়ে ঘুমুবে। নারদ বলে,

মাষ্টারদার এ কপচানীর মূল্য কি ? ওটাতো পাওনা। টার্মেই ঘুরে আসছে।

ঃ পার্টির এটাই নিয়ম। সবকিছুতে সমতা চাই।

মিলি চোখ মুদে এসব শুনছিলো। সামনের থেকে ভারী কণ্ঠে হেকে উঠলো,

ঃ নাথুরাম ব্যাটা কি মরেছে। মিলির সামনের জন ঝিমুনী কাটিয়ে বললো,

ঃ যে শালা ঘুমোয়—তার মায়ের ইজ্জৎ আমার বিছানায়। খস্ করে আবার একটা শব্দ। ম্যাচকাঠির আলো সামনে। যুবকটি সিগ্রেট ধরিয়ে ও কাঠিটা ফেলে দিল। বললো,

ঃ তোমাদের উর্ব্বশী এবারে নাক ডাকছে গো। সামনে থেকে কে বলে উঠলো,

ঃ নাক ডাকাচ্ছে। গতিয়ে দে একটু খানি। সামনের যুবকটি বললো,

লংকার ঝাল সবটাই ব্যাংকের দারোয়ানের চোখে রয়েছে। গুড়ো একটু খানি থাকলে এই বেলা প্যাণ্টটা টেনে নামিয়ে গুতিয়ে দিতুম বটে।

ভারী কণ্ঠ বলে উঠলো,

ঃ নাহে—এখানে আর ও কাজটি নয়। তাতে গ্যাং শুদ্ধ সবার জ্বালা ধরবে। কে আবার জল সাবানে ওর কুছকি থেকে গুড়ো বের করবে। জলন্ত ম্যাচের কাঠিটা ছুড়ে ফেলা হলো মিলির গালে—দারুণ কষ্ট। তবু নড়া যাবেনা। ইস—ফোসকাটা সাথে সাথে উঠে গেছে। যুবকটি খ্যা খ্যা করে হেসে উঠলো। সামনে থেকে প্রশ্ন এলো,

মৌজ হচ্ছে নাকিরে হতভাগা।

না গুরু। ম্যাচের কাঠিটা মেরেছি গালে—ফোসকা উঠে গেছে—

তবু রাধার ঘুম ভাঙছে না। রাধা? চমকে ওঠে মিলি। তবে কি এটা সেই মস্তান পার্টি? না। পরে ওদের কথায় বোঝা গেলো—এরা রঙ্গ করেই ওকে রাধা, শকুন্তলা, উর্ব্বশী এসব বলছে।

একটা শাড়াশির মতো হাত মিলির কোমরে। সেটা এক টানে ওর প্যান্টের বোতাম খুলে ফেললো। ভয়ার্ত মিলির নড়বারও জো নেই। একটা হাত ধীরে ধীরে ওর তলপেট বেয়ে জংঘার কাছে নেমে এলো। এবারে ত্রিকোনাকৃতি ঢিবিতে এসে সেটা থামলো। মানুষের রুচি কি কুৎসিৎ আগেও মিলির সে অভিজ্ঞতা হয়েছে। এই হাতের দুটো আঙুল পটাপট টানে মিলির গুপ্তস্থানের অবাঞ্ছিত লোমগুলো টেনে টুনে ছিড়তে লাগলো। একটিবারও উহ আহ করবার উপায় তার রইলো না। গালে আগুন পড়বার সময়কার মতোই দাঁতে দাঁতে চেপে রইল সে। একটু পরে প্রচণ্ড বেদনা দিয়ে পিস্তলের লম্বা নলটা ওর গুহ্যদ্বারে ঢুকিয়ে দেয়া হলো। ব্যথায়ককিয়ে উঠলো মিলি। কিন্তু শব্দ হলো না। বার বার নলটা যাতায়াত করছে। কি জানি গুলি বেরিয়ে যায় কিনা। ভয়ে সিটকে গ্যাছে মিলি। চোখ বেয়ে তপ্ত অশ্রু বেরিয়ে এলো। তবু সে বেঁচে গেছে—আসল স্থানটা ব্যথায় শিলাখণ্ড হয়ে আছে। ওটাতে অত্যাচার চলেনি। নাথুরাম বললো,

: যে যাই করো। মাল নামিয়েই আমার কাজটা সারতে হবে।

একটু পরে ফিনকি দিয়ে কিছু ভাতের মাড়ের মতো পদার্থ মিলির নাকে মুখে পড়লো। চোখের ফাক দিয়েও দেখলো নাথু প্যান্টের ফ্লাই খুলে ওর লম্বা ও উদ্ধত বস্তুটাকে সামনে ডানহাতে বিশেষ ভঙ্গিতে নাড়ছে। তারই গলিত লাভা ওর চোখে মুখে বিক্ষিপ্ত হয়েছে।

সামনের ভারী কণ্ঠ বললো'

ঃ মালটা শিক্ষিত হলেই দামটা উঠে যায়। কে একজন বললো,

: বাগদী পাড়ার ডোমের মেয়ে। শিক্ষিত হবেকি? ভারী কণ্ঠের জবাব এলো।

: নাহে গন্ধর্প? ওরা একে সংগ্রহ করছে। নিজেরা ফূর্তি করে বেঁচে দিয়েছে আমাদের কাছে। তবে মনে হচ্ছে শিক্ষিত। বন্দুক চালানো আর চব্বিশজনের সঙ্গে রাতের কাজটা চালাতে পারলেই চলবে। নারদ বললো,

: লাইনের মাল ওটা। পারবে।

: পারবে মানে? পারতেই হবে। জোর দিলো নারদ।

একটু পরে গাড়িটা ঝাকি খেয়ে থামলো। সামনে থেকে দুজনা নেমে রাস্তার ওপরই ওরা প্রস্রাব করতে শুরু করে দিল। এইতো সুযোগ। নাথু ঘুমুচ্ছিল কিন্তু এবারে সে জেগে উঠেছে। গাড়ীর মধ্যে এখোনো ভোরের আলো ঢোকেনি। সিগারেট মুখে দিয়ে খালি ম্যাচটা ফেলে দিল সে। সামনে গেলো ম্যাচ আনতে। আশ্চর্য। নাথুর পিস্তলটা ওর সিটেই পড়ে আছে। মিলি বিদ্যুৎ বেগে উঠে পড়লো। পিস্তল হাতে সে উল্টো পথে ছুটছে। গাড়িটা ছেড়ে চলে গেছে। একটু পরেই সেটা সশব্দে ব্রেক কষলো। রাস্তার এক ধারে ভীষণ খাঁড়ি। বুনো কাটা ঝোপ। ওর মাঝেই সে লাফ দিল। কিন্তু ভাগ্য খারাপ—সে গড়িয়ে পড়লো আরো গভীর অন্ধকার জঙ্গলে। পিঠে অযত্র কাটা ফুটে গেছে। হিস্ হিস্ করে কয়েকটা সিসের গুলি ওর চারধার দিয়ে উড়ে গেলো। মিলি ঘাড় উচু করে আত্মরক্ষার অবস্থান ঠিক করতে চাইলো। ভো করে কানের পাশ দিয়ে কটা গুলি বোলতার মতো পেছনে ছুটে গেলো।

আধঘন্টার মধ্যে নিজেকে সম্পূর্ণ নিরাপদ ভেবে জঙ্গলের মধ্যে এলোপাথাড়ি হাটতে লাগলো মিলি। সারা দেহে অযত্র সুইয়ের মতো কাটা বিদ্ধ। মিলি আর হাটতে পারছিলোনা। ত্রিশ চল্লিশ ফিট হাটবার

পর নীচের দিকে সরু একটা পিচের রাস্তা সে দেখতে পেলো। একটি টেক্সি ছুটে আসছে। মিলি দৌড়ে তার সামনে গিয়ে হাত তুললো প্রচণ্ড জোরে শব্দ ও ঝাকুনি খেয়ে গাড়ী থেমে গেলো,

ঃ আমাকে বাচান। আমি ডাকাতের দলে পড়েছি। মিনতি সুরে বললো মিলি।

ঃ ঠিক আছে এসো। পেছনের দরজা খুলে একজন টাইট গেঞ্জি পরা, কদমছাট চুল ও বিশাল গোফের লোক তাকে তুলে নিলো। কপালের বামধারে তার মস্ত কাটা দাগ। বিশাল দেহ। এক পাশে ভীত পায়রার মত বসে আছে মিলি। গাড়ি চলছে। কুৎকুতে চোখে লোকটি তাকে নীরিক্ষণ করে বলে,

ঃ ডাকাতের দলে পড়েছো খুকী?

ঃ হ্যা?

ঃ এসো তবে কোলে বসো।

ঃ না।

এসো। মিলি হাতের পিস্তলটা তার বুকে তুলে ধরে।

ঃ হঠাৎ গাড়ী থেমে যায়।

ঃ হাঃ হাঃ হাঃ দারুন সাহসীতো তুমি। তবে পিস্তলই ধরতে শেখোনি। ওভাবে কি পিস্তল ধরে কেউ? মিলি হাতের দিকে চাইতেই পলকে পিস্তলটি কেড়ে নিল সে। চিলের মতো ছো মেরে মিলিকে কোলে তুলে নিলো। হাসতে লাগলো বুনো পাগোলের মতো। চোখ দুটো বুনো হায়েনার মতো জ্বলছে। কামড়ে কামড়ে সে মিলির গাল গণ্ড-স্তন জোড়া রক্তাক্ত করে দিল। গাড়ীর মাঝে তাকে চিৎ করে ফেলে প্যান্টটা অনায়াসে সরিয়ে দিল।

ঃ না না।

ঃ আহ ভয় কি সুন্দরী। মেয়েরা সবাই এটা দেখে ভয় পায়—খুব বড়। তবে লাগবে না।

ঃ না—না প্রাণপণ বাধা দেয় মিলি তাকে। অসুরটা ওর বুকে

পড়ে এতো জোরে একটা চাপ দিলো যে হাড়গোড় ভেঙ্গে গুড়িয়ে গেল। বিষজ্বালাময় গুপ্তাঙ্গের চামড়া ছিড়ে যেনো টুকরো টুকরো ও রক্তাক্ত হলো। আবারও সঙ্গ হারালো মিলি।

অন্ধকার ঘুটঘুটে ঘরে ওর সঙ্গা এলো। চারিদিকে দমবন্ধ করা ভ্যাপসা আবহাওয়া। মৃত মানুষের কিছু হাড়গোড় হাতে পিঠে অনুভব করলো। একটু পরেই খুট করে শব্দ হলো। দেয়ালের সুরুঙ্গ পথে সেই লোকটা ঢুকলো,

ঃ আহ - ঘুম ভেঙ্গেছে তবে!
আমি কোথায়?

ঠিক যায়গাতেই এসে পড়েছো ডার্লিং। ভয় নেই।
তোমরা আমার সঙ্গে এমোন করছো কেনো?

লোকটা কোনো কথা না বলে সুরুঙ্গ পথে চলে গেল। মুখটা ভারী লোহার ডাকনায় আপনা আপনিই বন্ধ হয়ে গেলো। পাথরে ঘর। অন্ধকারে কয়েকটা চামচিকে উড়ছে। হাওয়া লাগছে তাদের ডানার। চারদিকে পিন পতন নিস্তব্দতা। ময়লা একটা কম পাওয়ারের লাল বাল্‌ব ওধারে জলছিল। গুহার মুখটা ঢাকা পড়ে আবার অন্ধকার হয়ে গেছে। বুকের ও কানের কাছে এক ঝাক আর শোলা ওকে সুড়সুড়ি দিচ্ছে। এককালে আরশোলাকে ও খুব ভয় করতো। আজ সেটা ভাবতেই পারছে না। খুট করে আবার শব্দ হলো। তিনজন অনুরূপ লোক ঢুকলো, মাঝের জনার শরীর যেনো ইস্পাত পিটিয়ে তৈরী করা। চোখে শ্যেন দৃষ্টি। হাতে চাবুক। সে এসে মিলির বুকে পা তুলে দিল। পাজরগুলো গুড়িয়ে যাচ্ছে। দাঁতে দাত চেপে বললো সে,

তুমি কার লোক? মিলি নির্বাক। শপাং করে একটা চাবুক তার বাহুর চামড়া তুলে নিল। আবারও একই প্রশ্ন,

তুমি কার লোক? মিলি নিরুত্তর। আবারও চাবুক তার চামড়া তুলে নিল। সে প্রশ্ন করে,

সি আই ডি না ডিটেকটিভ ব্রাঞ্চের?

: আমি ওদের কারু নই। কথা ভাল করে বেরুচ্ছে না মিলির কণ্ঠ থেকে। সে বলে,

তবে কার তুমি? সরকারি গুপ্তচর সেতো বুঝতেই পারছি।

না—আমি তা নই। লোকটি গর্জে ওঠে। চোখ ঠিকরে আগুন বেরোয়।

ফের মিথ্যা কথা? কি করে ব্লাড ব্যাংক তৈরী করি সেটা তেও দেখলেই। এবার ফ্রাড সাকারদের কাজটাও দেখে যাও। সে মুখ ফেরালো পাশের লোকটির দিকে। লোকটির হাতে মস্তবড় একটা সিরিঞ্জ। সে এগিয়ে এসে, মিলির একটা হাত দু পায়ে পারা দিয়ে হাতের মধ্যে বিশাল সুই ফুটিয়ে রক্ত বের করে নিতে লাগলো। মিলি যেনো মরে গেছে। ও আর কিছু বলতে চাইলেও পারছে না ও বার বার জল কথাটা বলতে চাইছে! কিন্তু মুখ দিয়ে শুধু—

: জ—জ—জ আওয়াজ হচ্ছে। একজন ঝুকে পড়ে শুনলো সব। সে উঠে দাড়ালো।

: হা কর। অর্দ্ধ অচেতন মিলি হা করে আছে। সারা মুখে ভরে আসছে গরম লাল বাওয়া জলের ধারা। সঙ্গা হারাবার আগে ওর মনে হলো ও বুঝি কারো প্রস্রাব খাচ্ছে। কিন্তু তা না খেয়েও যে প্রাণটা বাচাতে পারছে না মিলি।

কয়েক ঘণ্টা যেনো ও মরেছিলো। কে যেনো তার মুখে শক্ত বাসি রুটি পুরে দিল! গোগ্রাসে তা খেলো মিলি। পূর্ণ সঙ্গা প্রাপ্তির পর তাকে উঠিয়ে দাড় করানো হল। দেয়ালের দু ধারে দুটো কড়ার সঙ্গে সরু শেকলে ওর হাত আটকে ওকে ঝুলিয়ে দেয়া

হোল। আবার একই প্রশ্ন। একই অত্যাচার। ওরা বিশ্বাস করছে না মিলি সরকারি দলের লোক নয়। আবার সঙ্গা হারালো মিলি। এবারে জ্ঞান ফিরতে তার বিলম্ব হলো। যখোন ফিরলো তখোন পূর্ণ নগ্ন। অসুরের মতো লোকটা তাকে ধলংকারে পিশে মারছে। কাজ শেষে সে খুব ফূর্তি পেলো। চারি দিকের রুটিগুলো সেও গ্রাসে গিললো। অসুরটা নগ্ন অবস্থাতেই তার নিম্নাঙ্গটিকে ঝুলিয়ে দিল মিলির উপর। বললো,

চেটে পরিস্কার করো। মিলি যথাসাধ্য কষ্টে তা করেও অসুর টাকে খুশি করতে চায়। তার চোখ্ চকচক করে উঠছে! হ্যা হ্যা করে এক গাল হেসে সে বললো,

তুমি কি আসলে সরকারী আদমি নও?

না। মিলি তার পাদুখানি জড়িয়ে ধরে হাউমাউ করে কেদে ওঠে লোকটা প্রতিক্রিয়াহীনভাবে বলে,

মতলব খানা কি তবে?

মিলি মোটামোটি ভাবে সংক্ষেপে তার কাহিনীটা খুলে বলে। লোকটা সেটা বিশ্বাস করলো কিনা বোঝা গেলো না। শেষ দিকের কথা না শুনেই সে উঠে গেলো। দড়াম করে গুহার মুখ বন্ধ হয়ে গেলো আধাঘণ্টা পরে লোকটা আবার এলো। একটা লৌহ শলাকা তার হাতে। ভয় পাচ্ছিলো মিলি। লোকটা তাকে গুহার মুখ খোলার বুদ্ধিটা বাৎলে দিয়ে বললে,

এখোন নয়। চারঘণ্টা পর কাজটা করবে। সবাই বাইরে থাকবে। কারো দোষহবে না। তবে এই শিকটা এখানেই ফেলে যাবে, নয়তো সেখানেই পালাবে আমি সেখানেই তোমাকে খুন করবো।

মিলি যেনো এই প্রথম পৃথিবীর মুখ দেখছে। কিভাবে গুহার গহিন অন্ধকার ছেড়ে ও একটা ভাঙ্গাবাড়ীর কোন দিয়ে বেরিয়ে এলো

নিজেও বলতে পারবে না। স্বপ্নের ঘোরে মিলি যেনো হেটে চলেছে। শরিরে একতিলও কাপড় নেই। ভাগ্যিস সময়টা বিকেল। সরু একটা পথ বেয়ে নদীর বাতাস সে শরিরে অনুভব করলো। রাতের অন্ধ কারের প্রতিক্ষা তাকে করতে হবে। সামনেই কিছু লোকজনের হেইও হো হেইও শব্দ। কারা যেনো সামনের নদীর গুদাম থেকে জেটিতে কিছু মাল ওঠা নামা করছে প্রাচীন ও পতিত একটা পায়খানার অন্ধকার ঘরে আত্মগোপন করলো মিলি। ভাগ্য এক পাট দরজাটা ভেজিয়ে দিলো! লক্ষ লক্ষ মসা তার দেহে হুল ফোটাচ্ছে কটাকে মারবে ও?

সেখানে এসে বুঝতে পারলো মিলি এটা বিশাল নগরের মোয়ারেছ পাইপ। নগরের সব পৃতি দুর্গন্ধযুক্ত ময়লা এখান থেকে নদীতে মিশে যায়! ঐতো আরো একটা ট্রাক ঘো ঘো করে এগিয়ে আসছে। গুড়ি মেরে সন্ধ্যার অন্ধকারে এগিয়ে আসে মিলি। ঘড় ঘড় করে ট্রাকটা চলে যায়। এরপর সা সা করে দুটো জাগুয়ার গাড়ী চলে যায়। মিলি ভাবে,

একটু পরেই দুরে দুটো হেড লাইটের আলোক রশি ঝলকে ওঠে। দারুণ তেজস্বী আলো। উল্কার মতো ছুটে আসছে গাড়ীটা। আর বিলম্ব নয়? মিলি দ্রুত এগিয়ে যায়। হাত পনেরো দুরে থাকতেই মিলি ইশ্বরের নামটি স্মরণ করে পিচ ঢালা রাস্তায় আড়াআড়ি হয়ে টানটন হয়ে শুয়ে পড়ে। চোখ মুদে মৃত্যু দুতের সাক্ষাতের প্রস্তুতি নেয়। প্রচণ্ড একটা আঘাত ও শব্দ। মিলি বোধো মরেই গেছে। সাগরের অতলে তলিয়ে দমটা তার ক্রমেই আটকে আসছে। শরীরের কোনো যন্ত্রণা অনুভবের শক্তি তখোন তার নেই।

ওর যখোন হুস হলো তখোন সে বিষ মাংসপিণ্ডের মতো

একটা জাগুয়ার গাড়ীর পেছনের সিটে পড়ে আছে। ওর শরিরের ওপরে—বিশেষস্থান ঢাকা একটা পুরুষের কোট। চিন্তার শক্তিও তার রহিত হয়েছে। অতএব, আবার চোখমুদে পড়ে থাকা। অনেক ক্ষন ধরে গাড়ীটা চললো। আবার থামলো। মিলির দেহের ওপরে নতুন একটা শাড়ীর প্যাকেট ধুপ করে পড়লো। ক্রমেই সে চেতনা হারাচ্ছে। জ্ঞান ফিরে পেলো সে ডাঃ রমেন বিশ্বাসের নিজস্ব চেম্বারের অপারেশান টেবিলে। হাতে পায়ে গরম জলের মুছনী দিচ্ছে কে একজনা। ডাক্তার তার তদারকী করছে। ব্যাণ্ডেস অষুধ পড়লো। মুখ খুলে খাবার ওষুধ ও ইনজেকশান চললো। ৪।৫ ঘণ্টার মধ্যে মিলি কিছুটা সুস্থ হলে ডাঃ বিশ্বাস তার কাছে সমস্ত শুনে, জানতে চাইল তার বাড়ী কোথায়—কোন দিকে সে এখন যাবে।

প্রত্যুত্তরে মিলি বলল—সে আশ্রয়হীনা, তার কোথাও যাবার জায়গা নেই যেখানে সে চাকরী করত সে চাকরীও এখন নেই। একজনের বাড়ীতে সে কাজের সন্ধানে গিয়েছিল, সেখানে তারা কুকুর লেলিয়ে দিয়েছিল।

আদ্যপান্ত সব শুনে ডাঃ বিশ্বাসের কেমন মায়া হল। সে তাকে তার বাড়ীতে নিয়ে গেল। আবার নতুন করে স্বাভাবিক পৃথিবীতে ফেরা। ডাঃ বিশ্বাস বিপত্নীক, একটিমাত্র মেয়ে সুতপা মিলিরই বয়সী। ডাক্তারের বাড়ীতে একটি দাতব্য স্কুল আছে, এখানে ছেলেমেয়েরা পড়তে আসে। ডাক্তার নিজেই তাদের পড়ায়। যাদের ছেলেমেয়েদের স্কুলে পড়ানোর সঙ্গতি নেই, তারাই তাদের ছেলে মেয়েদের এই দাতব্য স্কুলে পাঠায়।

সুতপার সঙ্গে তার খুব ভাব হয়ে গেলে জীবনে এই কয়েকটি দিনেই বোধ হয় তার সবচাইতে ভাল কাটল।

একদিন সুতপা তাকে ডেকে বলল ,— চল একটা মজা দেখবে।

কি মজা ?

চল না দেখবে।

ক্লাস রুমের পেছনে দরজার ফাকে চোখ রেখে সুতপা ফিসফিসিয়ে বলল ঐ দেখ ?

ঘরে আর কোন ছাত্র ছাত্রী নেই, অল্পবয়সি একটি মেয়ে আর রমেন। মেয়েটি ভারি ঘাবড়ে গিয়ে বলছে, আমাকে ক্ষমা করুণ স্যার।

না, না। রমেন বলল। তোমাকে অনেকবার ক্ষমা করেছি ডলি, টুকে লেখা অভ্যাসে দাড়িয়ে গেছে।

না স্যার আমি টুকিনি। কাঁদো কাঁদো স্বরে ডলি বলল।

হ্যা, তুমি টুকেছ। রমেন চেচিয়ে উঠল :

সুপতা মিলির কানের উপর মুখ রেখে বলল, বাবা মিথ্যা কথা বলছে। এমনি মিথ্যা দোষ চাপিয়ে বাবার শাস্তি দেওয়ার অভ্যাস। মেয়েটিকে আমি জানি, পড়াশুনায় খুব ভাল আর অতি সৎ।

পকেট থেকে চাবুক বার করে রমেন মেয়েটিকে মারতে লাগল, হাতে পায়ে যেখানে যেমন পারল। গায়ে চাবুক পড়ছে আর ও লাফিয়ে উঠছে। রমেনের মুখে অদ্ভুত আনন্দ দেখা দিয়েছে। চোখে এক কুৎসিৎ দৃষ্টি। চাবুকের আঘাতে মেয়েটির ফ্রকের কিছু অংশ ছিড়ে গিয়েছিল। বাহিন বুক। পনের বছরের কিশোরী মেয়ের পুরু স্তনের অনেকটা অংশ এখন প্রকাশ পাচ্ছিল। রমেন সেদিকে শ্যেন দৃষ্টিতে তাকিয়ে ছিল, যেন সে গিলে খাচ্ছিল।

এরপর সে একটা অদ্ভুত কাজ করল। এক রকম জোর করে মেয়েটির ফ্রকের বোতাম খুলে তার দেহ থেকে সেটা টান মেরে খুলে ফেলল। এবার চাবুক চালালো। মেয়েটি যন্ত্রণায় কাতরে উঠল, অস্ফুট স্বরে বলল, আমাকে দয়া করে এভাবে মারবেন না!

ঠিক আছে আর মারব না। তবে আমার কথা শুনতে হবে। এখন থেকে আমি যা চাইব তাই তোমাকে দিতে হবে। রাজি ? হ্যা, রাজি !

রাজি না হয়ে উপায় ছিল না তার। তা না হলে ওকে মরতে হত রমেনের হাতে মার খেয়ে।

রমেন তার সম্মতি পাওয়া মাত্র তার পরনের শেষ পোশাক অর্থাৎ পাজামাটা খুলে ফেলল এবং নিজে বিবস্ত্র হয়ে মেঝের ওপর তাকে ধর্ষণ করতে থাকে ! মিলি চমকে উঠল। নিজের লোমহর্ষক অভিজ্ঞতাটি মনে পড়ল। অত বড় পুরুষাঙ্গ মেয়েটি কি করে সহ্য করবে। ঠিকই সে সহ্য করতে পারছিল না। রমেনের কোমর দোলানর সঙ্গে সঙ্গে কাতরে উঠছিল সে বারবার।

কান্না জড়িত কণ্ঠে বলল, দয়া করে আমাকে ছেড়ে দিন, আমাকে যেতে দিন। আমি মরে যাবো।

কেন তবে রাজি হয়েছিলে তখন ? এখন একটু লাগবে বৈকি। সহ্য করো শেষে আরাম পাবে। বলে চরম সুখের জন্যে লড়াই করতে প্রস্তুত হল রমেন। অসভ্য মানুষ ও দেখেছে। কিন্তু এরা কারা সভ্য মানুষের নামে অসভ্য জারোয়ার ?

এ ক্ষেত্রে মেয়েটি সত্যিই কোন যৌনসুখ পেয়েছিল কিনা মিলি তা জানে না। তবে অনেকক্ষন পরে তাকে কাঁদতে কাঁদতে ঘর থেকে বেরিয়ে যেতে দেখা গেল।

এমনি ভাবে দোষ দেখিয়ে পরে আরো দু জন ছাত্রীকে নিদারুন চাবুক পেটা করে তাদের প্রাণেরভয় দেখিয়ে রমেন সেই অল্পবয়সী চৌদ্দ পনের বছরের কিশোরী মেয়েদের ওপর পাশবিক অত্যাচার করত।

এর কয়েকদিন পর মিলির ওপর নজর পড়ল ডঃ রমেন বিশ্বাসের।

তখন দুপুর। মিলি শুয়েছিল তার ঘরে।

দরজাটা ভেজান ছিল। রমেন দরজাটা ঠেলে ঘরে ঢুকল হঠাৎ। মিলি তার অবিন্যাস্ত ফ্রকটা ঠিক করে নিয়ে সঙ্গে সঙ্গে উঠে দাড়াল। এক অজানা আশঙ্কায় তার বুক কেঁপে উঠল।

রাধা—রমেন বলল। তুমি তো এখন সম্পূর্ণ সেরে গেছ। প্রতিদিন আমাকে কি দেবে বল ?

মনে মনে চমকে উঠল মিলি। এমনি একটা কিছু আশংকা করছিল সে। তবে মুখে সেটা প্রকাশ করল না। তাড়াতাড়ি নিজেকে সামলে নিল।

আমি আপনাকে কিই বা দিতে পারি বলুন ? দেবার মত আমার এমন কি আর আছে ?

তুমি বলছ কি ? এমন সুন্দর তোমার দেহ অথচ তুমি বলছ তোমার দেবার মতো কিছু নেই ?

না, আপনি যা চাইছেন সেটা আমার পক্ষে দেওয়া সম্ভব নয়' মিলি এবার মুখ খুলতে বাধ্য হল। সে আরো বলল—আমি বরং আপনার বাড়ী ছেড়ে চলে যাচ্ছি।

অবাক হয়ে গেল রমেন ডাক্তার মিলির কথা শুনে। মেয়েটা বলে কি ? যার বাড়ী ঘর নেই। কোন জায়গা নেই যাবার। যার হাতে পয়সা কড়ি কিছুই নেই। সে তার প্রস্তাবে রাজি হবেনা এটা ভাবা যায় না। না অসম্ভব ব্যাপার।

রমেন কিন্তু রাগল না কিংবা একটুও উত্তেজিত হল না। এই প্রথম একটি মেয়ে তাকে প্রত্যাখান করল। তবু তার কোন ক্ষোভ নেই। কিংবা কোন ক্ষমতা প্রয়োগ করার ইচ্ছে তার মধ্যে প্রকাশ হতে দেখা গেল না।

ঃ ঠিক আছে। শান্ত ভাবে সে বলল, তোমাকে যেতে হবে না রাধা,

আর কিছুই তোমাকে দিতেও হবে না। সুতপা তোমাকে ভালবাসে। তুমি চলে গেলে সে কষ্ট পাবে। তবে এক মুহূর্তের জন্যেও ভেব না তোমার সতীত্বের এক কানাকড়ির মূল্য আমার কাছে আছে। রমেন তার ঘর থেকে চলে গেল।

ওদিকে মিলি সেইদিনই ঠিক করল এ বাড়ীতে তার থাকা আর নিরাপদ নয়। এখান থেকে তাকে পালাতে হবে যে ভাবেই হোক।

কিন্তু যাওয়া হল না। সন্ধ্যেবেলা খাবার ঘরের পাশ দিয়ে যাবার সময় তার কানে এলো কে যেন তখন বলছিলকিন্তু এই পরীক্ষা করতে গেলে তোমার মেয়ে সুতপার মৃত্যু হতে পারে। সেটা ভেবে দেখেছ কি ?"

রমেনের বন্ধু ডঃ বিভাস প্রায়ই এ বাড়ীতে আসে। দু'জনের মধ্যে গভীর বন্ধুত্ব।

তাতে কি এসে যাচ্ছে, রমেন বলল, বিজ্ঞানের উৎকর্ষের জন্যে যদি তার মৃত্যু হয়, ক্ষতি কি ? তাছাড়া এটা তো একটা এক্সপেরিমেণ্ট মাত্র মামুলি এক্সপেরিমেণ্ট ! সঙ্গমের এক্সপেরিমেণ্ট। সিম্পাঞ্জী ও তো প্রাণী ? আমি দেখতে চাই জানোয়ার আর মানুষের সঙ্গমে নতুন কোনো প্রাণীর সৃষ্টি হয় কিনা। আর হলে পরে সে কি ধরণের প্রাণী হতে পারে সেটাই দেখার বিষয়। এ জন্যে হয়ত সুতপার দেহের ওপর বার কয়েক অত্যাচার করা হবে। আমি জেনে নিয়েছি সুতপার মাসের অসুখ হয়েছে আজ থেকে দিন দশেক আগে। এ সময়ে ওর সঙ্গে বার পাঁচেক সঙ্গম করলে ওর পেটে বাচ্চা আসতে বাধ্য। অবশ্য যদি জানোয়ারের বীর্যে মানুষ সুতপার যোনিগর্ভে ভ্রূণের জন্মানোর কোনো সম্ভাবনা থেকে থাকে। আর সেটাই হবে আমাদের একমাত্র এক্সপেরিমেণ্ট বুঝলে ডঃ সেন এখন বল, তুমি রাজি আছো তো।

ঃ হ্যাঁ, আমি রাজি আছি বৈকি!

ঃ ঠিক আছে। আর মিনিট পনেরো পরে শুরু করে দেওয়া যাবে।

ওকে নিয়ে যাব আমরা গোপন এ্যাণ্টিক চেম্বারে। সিম্পাঞ্জীকে সেখানেই বেঁধে রাখা হয়েছে। যৌন উত্তেজনা বাড়ানোর জন্য খানিক আগে তাকে একটা ইনজেকসান দিয়ে এসেছি। এতক্ষণে সে বোধহয় মানুষের মতন নিজের পুরুষাঙ্গ বার করে হস্তমৈথুন করছে দেখা গিয়ে। রমেন হাসল নিজের রসিকতায়। বিদঘুটে রহস্যময় হাসি।

তার সেই কুৎসিত হাসি শুনে মিলির হৃৎপিণ্ড লাফিয়ে উঠল। সে তখুনি সেখান থেকে ছুটে পালাল সুতপার ঘরের দিকে খবরটা দেওয়ার জন্য।

কিন্তু, সুতপাকে বলতেই সে হেসে উঠল। বাবা আমার উপর এমন কোন পরিক্ষা করতে পারে না, যেখানে আমার মৃত্যুর সম্ভাবনা আছে।

পারেন, দৃঢ় গলায় মিলি বলল, তুমি তো নিজের চোখে দেখেছ, কি নিষ্ঠুর প্রকৃতির লোক তিনি। তার হৃদয় বলে কোন পদার্থ নেই। আমি এইমাত্র নিজের কানে শুনে এসেছি। তুমি আর মিথ্যে সময় নষ্ট করো না সুতপা, যে কোন মুহূর্তেই ওঁরা এখানে এসে পড়তে পারেন। যদি প্রানে বাচতে চাও তো আমার সঙ্গে চলে এসো, আমরা এখান থেকে পালিয়ে যাই। আমার সঙ্গে তুমি যদি যেতে না চাও তাহলে এখান থেকে অন্তত বেরিয়ে তুমি বরং পুলিশের আশ্রয় নাও। আমি আমার ব্যবস্থা করে নেবো, শীগগীর এসো।

কিন্তু দরজার বাইরে ওরা ধরা পড়ে গেল।

সামনেই রমেন আর বিশাল দেহ নিয়ে দাড়িয়েছিল ডঃ বিভাস সেন।

রমেন বলল, ছুড়িটা আড়ি পেতে নিশ্চয়ই আমাদের কথা শুনেছে। তাই সে পালিয়ে যাচ্ছে। ধর ওদের।

মিলি আর সুতপাকে ওরা ধরে নিয়ে গেল রমেনের এ্যাণ্টি

চেম্বারে। বিভাস মিলিকে ঠেলতে ঠেলতে একটা সোফার ওপর ফেলে দিল।

রমেন বলল, তুমি যা করতে যাচ্ছ সেটা কোনো শাস্তিই নয়? তার চাইতে লোহা পুড়িয়ে ওর যোনিতে ঢুকিয়ে দিই, যাতে করে ও ওর মনের মানুষের সঙ্গে সঙ্গম করতে না পারে!

সে পরে, হবে আগে তো একটু সুখ করে নিই। বলে সে মিলিকে নগ্ন করে সোফার উপরই তাকে ধর্ষণ করল। মিলি দু,হাত দিয়ে তাকে বাধা দেওয়ার চেষ্টা করল কিন্তু বিভাসের শক্তির কাছে ব্যর্থ হল সে। বিভাস চরম সুখে পৌছান না পর্যন্ত তাকে ছাড়ল না।

ওদিকে রমেন আগুনে লোহার শিক পুড়িয়ে নিয়ে দাড়িয়েছিল সোফার সামনে। বিভাস তাকে ছেড়ে উঠে দাড়াতেই রমেন মিলির সদ্য সঙ্গম সমাপ্ত যোনির ভেতরে গরম লোহার শিকটা ঢুকিয়ে দিল যন্ত্রণায় চিৎকার করে উঠল মিলি। সাড়া বাড়ীটা তার সেই চিৎকারের শব্দে কেপে উঠল। পর মুহূর্তেই জ্ঞান হারিয়ে ফেলল সে।

বিভাস বলল—তুমি সিম্পাঞ্জীকে আর একটা ইনজেকসান দিয়ে তালিম দিতে থাক। আমি ততক্ষণে এটাকে বাইরে কোথাও নির্জন জায়গায় ফেলে রেখে আসছি।

বিভাস সংজ্ঞাহীনা মিলিকে কাধে তুলে নিল। সিড়ি দিয়ে নেমে এলো নিচে। গাড়ী তার তৈরী ছিল। রাজপুর এখান থেকে বেশি দূরে নয়। মাঝ পথে ঝোপ ঝাড় দেখতে পেলে সেখানে মিলিকে ফেলে দেবে গাড়ী থেকে। তারপর গাড়ী ঘুরিয়ে আবার গড়ীয়ার দিকে ছুটে চলবে।

শেষ রাত্রে মিলির জ্ঞান ফিরে এলো। জ্ঞান ফিরে পেয়েই আবার সেই তীব্র যন্ত্রণা অনুভব করল সে দুই উরুর সন্ধিস্থলে। তবে আগের চেয়ে যন্ত্রণার তীব্রতা যেন একটু কম। রাস্তাটা চলে গেছে দক্ষিনে ডায়মণ্ডহারবারের দিকে। এখানে কোন নিরালা গ্রামে সে হয়ত শান্তি

পেতে পারে।

কোমরে বাধা থলিতে কিছু সঞ্চিত অর্থও ছিল সেটাই অন্যতম সান্ত্বনা। সামান্যই খরচ হয়েছে তার। দিনের বেলায় হেটেছে, রাত্রে আশ্রয় নিয়েছে সস্তা কোন হোটেলে। যোনির ঘা শুকিয়ে আসছে তবে প্রস্রাব করতে গেলে লাগে। এর উপর কেউ যদি এখন তার সঙ্গে সঙ্গম করে। মিলি শিউরে উঠল। না, না—

প্রায় সন্ধ্যে হয়ে আসছে। নির্জন পথ। সে বুঝতে পারল না রাতটা কোথায় আশ্রয় নেবে।

একজন রাখাল আসছিল একদল গরু নিয়ে। মিলি তাকে থামিয়ে জিজ্ঞেস করল—রাত্রির জন্য কোথায় একটু আশ্রয় পাওয়া যায় বলতে পার।

রাখাল বালক তাকে বলল, খানিকটা এগিয়ে গেলেই একটা মন্দির পাবে। সেখানে কয়েকজন সন্ন্যাসী থাকে। সে শুনেছে খুব ভাল লোক তারা। রাত্রির জন্য সে আশ্রয় নিতে পারে।

মিলি তাকে ধন্যবাদ জানিয়ে তাড়াতাড়ি পা চালাল।

কিছুদূর এসে অস্পষ্ট অন্ধকারে সে মন্দিরে চূড়া দেখতে পেল। চারিদিকে বিরাট বাগান। দেওয়ালে চারিদিক ঘেরা মন্দিরটা।

প্রবেশ পথে গেটের কাছে ছোট ঘরে আলো জ্বলছিল। ঘরে উকি দিয়ে মিলি দেখল একটি লোক সেখানে বসে আছে। মিলি তার কাছে গিয়ে জিজ্ঞেস করল—সে কি মন্দিরে আশ্রয় পেতে পারে।

লোকটি বলল সে বাগানের মালি। যদি অপেক্ষা করে সে খোজ নিয়ে আসতে পারে।

মিলি একটা টুলের ওপর বসল। মালি গেল ভেতরে।

মিনিট দু'য়েক পরে দরজার কাছে সন্ন্যাসীর পোষাক পরা এক

বিকট দর্শন লোক তাকে কর্কশ স্বরে জিজ্ঞেস করল—মন্দিরে আসবার সময় তুমি আর পেলে না? তোমাকে দেখে তো মনে হচ্ছে তুমি একজন নিশাচর তা কি চাও বল?

মিলি বিনীত গলায় বলল, একটু আশ্রয় চাই।

আশ্রয় দেবার মালিক আমাদের প্রধান। তাকে জিজ্ঞাস করতে হবে। তুমি একটু বসো।

প্রায় আধাঘণ্টা পরে মন্দিরের প্রধান আভায়নন্দ মহারাজ এলো। পরনে সন্ন্যাসীর আলখাল্লা। খুব সুন্দর চেহারা, দেখলে ভক্তি হয়।

তুমি আশ্রয় চাও? এসো ভেতরে। শান্ত দয়ালু গলার স্বর।

মন্দিরের চাতাল পেরিয়ে ওরা ভেতরে ঢুকল। একেবারে শেষপ্রান্তে বসবার উঁচু আসন। আভয়ানন্দ মহারাজ সেই আসনে বসলো।

বসো। যদি কিছু স্বীকার করতে চাও বলতে পার আমার কাছে বুকের বোঝা তোমার কিছুটা হালকা হবে।

মিলি বসল। এমন একজন লোকের কাছে তার দুঃখের কথা বলতেই সে চায়। আগাগোড়া সব কিছুই খুলে বলল। সে একটি ঘটনাও বাদ দিল না। যাকে ডাকাতের হাত থেকে বাচিয়েছিল, গাছতলায় তার অত্যাচারের কাহিনি পর্যন্তও সে গোপন করল না।

আভয়ানন্দ আসন ছেড়ে দাড়াল।

আজ আর নয়। এ পর্যন্তই শেষ। এবার কিছু খেয়ে দেয়ে বিশ্রাম করো। কাল ভোর বেলা মন্দিরে গিয়ে আমাদের গুরুদেবের কাছে প্রার্থনা করবে তাহলে শান্তি পাবে। এসো আমার সঙ্গে।

ঘর পেরিয়ে অন্ধকার দালান। ওই অন্ধকার পেড়িয়েই চললো ওরা। আমার পেছনে পেছনে এসো। সন্ন্যাসীটি বললো—

খানিকটা এসে ভয় পেল মিলি। কোথায় সে তাকে নিয়ে যাচ্ছে।

থামল সে।

আভয়ানন্দ তাকে ধমক দিল। কি হল তোমার থামলে কেন?

মিলি তাড়াতাড়ি উত্তর দিল, না কিছু হয়নি।

অন্ধকার সিড়ি দিয়ে ওরা উপরে উঠল। আভয়ানন্দ বন্ধ দরজা টোকা মারতেই দরজা খুলে গেল।

আভয়ানন্দ হাত ধরে তাকে ভেতরে নিয়ে গেল।

ঘরটা বেশ বড়। আলো জলছিল। মাঝ খানে বড় টেবিলে গোল হয়ে খেতে বসেছে তিনজন পুরুষ আর চারটি মেয়ে। আর চারটি মেয়ে তাদের খাবার পরিবেশন করছে।

আভয়ানন্দ মিলিকে জোরে ধাকা মেরে সামনে এগিয়ে দিল।

এই যে দেখছ এ এক অদ্ভুদ চীজ—সতি মেয়ে। অথচ পিঠে গায়ে দেহের গোপন অঙ্গে বেশ্যাবৃত্তির ছাপ মারা। মনে মনে আজও ও কুমারি। ক্লীবানন্দ দেখ তোমার ঝিমিয়ে পড়া আত্মাকে এ যদি তাজা করে তুলতে পারে।

বা। বেশ! ক্লীবানন্দ বলল, পরিক্ষা করে দেখতে দোষ কি?

মিলি কয়েক পা পিছনে সরে এলো। বুক কাঁপতে লাগল তার। এ সে কোথায় এলো? এখানে যে সেই একই কাহিনি পুনরাবৃত্তি হতে চলেছে।

আভয়ানন্দ বলল, ওসব বাদমারি ছাড়। বাধা দিয়ে কোন লাভ হবে না। দেখছ অন্য মেয়েদের কি শান্ত আচরণ। অবশ্য প্রথম যখন ওরা এখানে এলো যথেষ্ট হৈ চৈ করেছিল। ওরা চট্ করে বুঝে নিল এখানে কেঁদে ককিয়ে কোন লাভ হবে না, যখন দেওয়ালে ঐজিনিষগুলো ওদের লেখিয়ে দেওয়া হল।

মিলি দেওয়ালের দিকে তাকাল। লোহার বুকে ঝুলছে ছোট বড় লোহার ডান্ডা পেরেল, হাতুড়ি আর অত্যাচারের ব্যবহার জিনিস।

মিলি আভয়ানন্দের পা জড়িয়ে ধরল। যত রকমভাবে পারে সে অনুনয় করল তাকে এই অত্যাচারের হাত থেকে নিস্পতি দেওয়া হোক।

ক্লীবানান্দ,— আভয়ানন্দ বলল, ধর ওকে। চোখের জল আর প্রার্থনার কোনো মুল্য নেই, এটা ওকে বুঝিয়ে দাও। অন্যের চোখের জল আমাদের গভীর আনন্দ দেয়।

ক্লীবানন্দ চেয়ার ছেড়ে মিলিকে হ্যাচকা টানে মাটি থেকে টেনে তুলল। আর একজন সন্ন্যাসী দড়ি থেকে এক সরু লোহার রড খুলে তার হাতে দিল।

ক্লীবানন্দ রডের বাড়ি মারতে লাগল তার হাটুতে। হাটুতেই বেশী যন্ত্রণা বোধ হয়। মিলি চেচাতে লাগল। ক্লীবানন্দ ওর শরীরের কোন জায়গা আর বাকি রাখল না। মাটিতে গড়াগড়ি দিতে লাগল সে, এবং মুখে বলতে থাকল আমায় মেরে ফেল, মেরে ফেল।

হাসির তরঙ্গ বয়ে গেল ঘরের মধ্যে।

এরপর অন্য দু,জন চাবুক নিয়ে তাকে মারতে লাগল।

মিলি অজ্ঞান হয়ে গেল।

যখন জ্ঞান হল সে দেখল ভোর হয়ে গেছে। একটা ঘরে সাতটি বিছানা। ছটা বিছানা খালি, একা শুয়ে আছে। সারা গা ফুলে গেছে তার। কোথাওবা চামড়া কেটে গেছে। ব্যথায় হাত পা নাড়তে পারছে না।

ঘরে ঢুকল একজন সন্ন্যাসী এর নাম ভবানন্দ। সে বলল সকল মেয়েরা কখন উঠে তাদের কাজ শুরু করে দিয়েছে কাল তোমার ওপর ভীষণ ধকল গেছে কিনা। তাই তোমাকে জাগান হয়নি। এখন যাও ব্রেকফাষ্ট টেবিলে। সন্ধ্যে বেলা তোমাকে ক্লীবানন্দের ঘরে যেতে হবে। তোমাকে তার ব্যক্তিগত পরিচারিকার কাজ করতে হবে।

ভবানন্দ চলে গেল।

মিলি আবার চোখ বুজল। বিছানা থেকে উঠে যাবার আর শক্তি নেই তার। ঘুমিয়ে পড়ল সে।

বিকেলের দিকে একটি মেয়ে তাকে ঠেলে জাগিয়ে দিল। তার হাতে এক বাটি খাবার। ক্ষিধেয় পেট মোচড়াচ্ছে তার। খাবারটা খেয়ে নিল সে।

মেয়েটি তাকে একটা পরিষ্কার জামা দিল পরতে। সাদা মোটা কাপড়ের ফ্রক। ওপাশে স্নানের ঘর আছে, মুখ ধুয়ে তৈরী হয়ে নাও। তোমাকে যেতে হবে ক্লীবানন্দের ঘরে। আজ থেকে তুমি তারপরিচারিকা হলে।

আমায় কি করতে হবে? ভয়ে ভয়ে জিজ্ঞেস করল মিলি।

তা কি করে বলব। ওঁর কখন কি খেয়াল হবে কিছুই বলা যায় না। যাও, তাড়াতাড়ি কর।

মারবে?

হ্যাঁ, মারতে পারে অবাধ্য হলে।

আচ্ছা, ওঁরা আমাদের মেরে কি আনন্দ পায় বল তো।

মেরেই তো আনন্দ।

মিলি জামা নিয়ে ঢুকল স্নানের ঘরে। স্নান করে ও একটু সুস্থবোধ করতে লাগল। ক্লীবানন্দের ঘরে ঢুকে মিলি দেখল সে একটা চেয়ারে বসে আছে! তাকে ডাকল, এসো মিলি। দেখি কেমন হল তোমার গায়ের দাগ।

মিলি হাত দেখাল, অন্যহাত বাহু দেখাল হাটু পর্যন্ত ফ্রক তুলে দেখাল।

জামাটা তোলো ওপরে কোমর পর্যন্ত। ক্লিবানন্দ হুকুম করল।

এক মুহূর্তের জন্যে দ্বিধা করল সে, কিন্তু তখনি তার মনে পড়ে গেল গতরাত্রির মারের কথা। আস্তে আস্তে সে তার পরনের ফ্রকটা তুলতে

লাগল ওপরের দিকে।

কি হল? এত দেরী কিসের।

জামাটা সে কোমর পর্যন্ত তুলে ফেলল। পরনে আর কিছুই ছিল না, সব সে খুলে দিয়েছে।

পেছন ফের।

জামাটা প্রান্তটা পেটের কাছে ধরে মিলি ঘুরে দাড়াল।

কই, পেছনটা তো বেশ পরিস্কার দেখছি, কোন দাগ নেই।

চেয়ার থেকে উঠে ক্লীবানন্দ একটা চাবুক নিয়ে একবার শূন্যে দুলিয়ে নিল। সাইকরে একটা শব্দ হলো। মিলি ঠিক করলো সে বাধা দিবেনা। মুখ দিয়ে শব্দ পর্যন্ত করবেনা।

প্রথম চাবুকের ঘায়ে তার চামড়া যেন ছিড়ে গেল। তবে সে একটুও কাপল না।

ক্লীবানন্দ বিস্মিত হল। এমন একটা কাঠের পুতুলকে আঘাত করে কি লাভ? তবু পঞ্চাশ ঘা বেত বসাল সে তার পেছনে।

এবার জামা নামাও। ক্লীবানন্দ হুকুম করল।

মিলি জামা নামিয়ে ঘুরে দাঁড়াল।

ক্লীবানন্দ দেখল তার চোখে এক ফোটা জল নেই। সত্যিই মেয়েটা তাকে বিস্মিত করেছে।

বসো মিলি। সে বলল।

কিন্তু চামড়া তার জ্বলছে, ফেটে গিয়েছে কয়েক জায়গায় বসা যাবে না। বসল না মিলি। মৃদু গলায় শুধু বলল, এমন সাংঘাতিক যন্ত্রণা দিয়ে আপনারা কি আনন্দ পান বলতে পারেন?

প্রকৃতি যন্ত্রণা দিয়ে কি আনন্দ পায়? ক্লীবানন্দ বলল, প্রকৃতি সব সময় ধ্বংশ করে চলছে, হত্যার আনন্দে মেতে আছে সব সময়। তুমি দুর্ভাগ্যক্রমে মেয়ে হয়ে জন্মেছ মিলি, তাই এই প্রশ্ন করছ। যদি

দৈবাৎ নেকড়ে হয়ে জন্মাতে তাহলে আর এই প্রশ্ন করতে না।

ঘণ্টাখানেক ক্লীবানন্দ তাকে এমনি বক্তৃতা দিল। হয়ত এমন শ্রোতা সে আর পায়নি। সেদিনটা এমনি কাটল। এর পর প্রায়ই ক্লীবানন্দ তাকে উলঙ্গ করে চাবুক পেটা করত। কিন্তু না পেরেছে তার চোখের জল বার করতে না পেরেছে তার মুখ দিয়ে কান্নার শব্দ বার করতে।

তবে আর তার আনন্দটা কি? ক্লীবানন্দ মিলিকে নিয়ে ক্লান্ত হয়ে পড়েছে। কি করা যায় এখোন ভেবে পাচ্ছে না ক্লীবানন্দ।

মিলির একমাত্র সান্ত্বনা সে কোনদিন তার ওপর দৈহিক অত্যাচার করতে চায়নি। অন্যান্য মেয়েদের কাছে যে সব বীভৎস অত্যাচারের কাহিনী শুনে হাত পা ঠাণ্ডা হয়ে গেছে তার।

মেয়েরা সমস্ত আশা নির্মূল করে বসে আছে। কিন্তু মিলি আশা ছাড়তে পারেনি। ভগবানের দয়ার ওপর আজও তার অখণ্ড বিশ্বাস। বিপদে তিনি অনেক ফেলেছেন ঠিকই কিন্তু উদ্ধারও করেছেন?

ক্লীবানন্দের ঘরে কাঠের বাক্সে শাস্তির অসংখ্য জিনিষ। বাক্স খুলে সে একদিন চুরি করল একটি যন্ত্র। সে জানে না যন্ত্রটির কি নাম। বাটালি জাতিয় কিছু। ধারালো দাঁত। সে দাঁতে লোহা কাটবার জন্য ব্যবহার হয়। কয়েক হাত লম্বা দড়িও সঙ্গে নিল মিলি।

দু মাস ধরে একটু একটু করে জানালার একটা রড সে কাটল, যখনই সময় পায়, সুযোগ পায়। পরিক্ষা করে দেখল হাতের চাপ দিলেই বড় রড খুলে যাবে। সুযেগের অপেক্ষা করতে লাগল সে।

মিলি বিকেলে শুনল আর একটি মেয়েকে চুরি করে এনেছে সন্ন্যাসীরা। ষোল বছরের অপরূপ সুন্দরী মেয়ে। ধনির কন্যা। সন্ধ্যে-বেলা ওর দীক্ষা হবে। সে উপলক্ষে বিশেষ খাওয়া দাওয়ার ব্যবস্থাও হয়েছে।

সন্ধ্যার আগেই মেয়েরা ঘর থেকে চলে গেল।

মিলি অন্ধকার হওয়া পর্যন্ত অপেক্ষা করল। হাত দিয়ে জানালার রড খুলে ফেলল। আর একটা রডে দড়িটা শক্ত করে বাধল সে।

হৃতপিণ্ড লাফাচ্ছে দারুন বেগে। নিঃশ্বাস নিতে কষ্ট হচ্ছে তার।

দড়ি ঝুলিয়ে দিল নিচে। তারপর জানালায় উঠে দড়ি ধরে আস্তে আস্তে নিচে নেমে এলো মিলি। একেবারে শেষ মুহূর্তে লাফিয়ে পড়ল ঘাসের ওপরে সে।

ঘন অন্ধকার। কোন সারাশব্দ নেই। হঠাৎ মন্দিরের ভেতর থেকে অস্পষ্ট চিৎকার তার কানে এলো। সেই নতুন মেয়েটাকে মারছে তারা।

মিলি সীমানা দেওয়াল লক্ষ্য করে ক্ষিপ্ত পায়ে এগিয়ে গেল। এটা ছিল বাড়ীর পিছন দিক।

সীমানা দেওয়াল খুব বেশী উচু নয়, টপকাতে খুব বেশী অসুবিধা হল না তার। মুক্ত হয়ে এবার সে ছুটবে অন্ধকারে, যেদিকে চোখ যায়।

আধাঘণ্টা পরে বারুইপুরে এসে রেলওয়ে ষ্টেশনে বিশ্রাম নিল সে। ষ্টেশনে এবং রাস্তায় লোক চলাচল করছিল তখনো।

মিলি আস্তে আস্তে আবার রাস্তায় নেমে হাটতে শুরু করে দিল। কিছুক্ষণ পরে একটা হোটেলে আশ্রয় নিল সে। এখানেই তার রাত্রিটা কাটল।

পরদিন সকালবেলা হোটেলের মালিকের কাছে কাজের খোজ করল মিলি।

সব শুনে মালিক তাকে বলল, এই অঞ্চলে সব চাইতে ধনি লোক অশোক চৌধুরী তার স্ত্রীর জন্য একজন দাসী খুজছিলেন। তুমি চেষ্টা করে একবার দেখতে' পার।

ওর কাছ থেকে ঠিকানা জেনে মিলি চলল অশোক চৌধুরীর বাড়ী

বিরাট বাড়ী প্রাসদোপম। তবে বড় বেশি চুপ চাপ, নির্জন। চাকর তাকে নিয়ে গেল অশোকের খাস কামরায়।

অশোক বসেছিল আরাম কেদারায় পিঠ ঠেকিয়ে। যৌবন পেরিয়ে প্রৌঢ়ত্বে পা দিয়েছে সে। দীর্ঘ বলিষ্ট চেহারা।

তুমি কাজ করবে? প্রশ্ন করলেন অশোক চৌধুরী।

ঃ আজ্ঞে হা।

দেখি তোমার হাতটা।

মিলি তার কাছে এগিয়ে গিয়ে একটি হাত তার হাতে তুলে দিল।

অশোক প্রথমে একটা হাত এবং পরে অন্য হাত দেখল।

কখনো তোমার শরীর থেকে রক্তপাত হয়েছে।

না স্যার।

অশোক দাড়াল। এসো পাশের ঘরে।

মিলি তার সঙ্গে পাশের ঘরে গেল।

দুটি যুবক তাকে দেখে উঠে দাড়াল।

অশোক একজনকে বলল, শ্যামল দেখি সুচের বাক্সটা।

মিলি শিউরে উঠলো। এখানেও কি মন্দিরের ব্যাপার নাকি। হায় ঈশ্বর। সে যেন বিশ্বাস করতে পারছেনা। সব জায়গাতেই কি এক?

আমার স্ত্রীর কাজে এসেছ, দেখি তোমার রক্তে কোন গোলমাল আছে কিনা।

মিলি ভাবল, তা দেখুন। সুচের একটা ফোঁড় তার কাছে কিছুই নয়। শ্যামল মনিবকে বাক্সটা দিয়ে মিলিকে শক্তকরে বলল। অন্য চাকর ধরল আর এক দিকে।

মিলি তাদের বলল, ধরতে হবে না, একটু রক্ত নিতে দুজন লোককে কাপটে ধরতে হবে না—

ধরুক। বলল অশোক।

বাক্সটা খুলে সে সুচ ও ছুরি বার করল, টিকা দিবার জন্যে যে ছুরি ব্যবহার করা হয়, প্রায় তেমনি।

এক জায়গায় নয়, দুই হাতের অনেকগুলো জায়গায় অশোক এই ধারালো ছুরি দিয়ে চিরে দিল। ফিনকি দিয়ে রক্ত গড়িয়ে পড়তে লাগল।

মিনিট খানেক পরেই মিলি বুঝতে পারল তার শরীরটা ভীষন দুর্বল হয়ে পড়েছে।

হায় ঈশ্বর ? হায়রে তোমার দুনিয়া ?? এবার থাক ! আর কতো পরীক্ষা করবে আমায়। আমি যে আর পারছি না, আমাকে দয়া করুন—আমি অজ্ঞান হয়ে যাচ্ছি।

কিন্তু ওরা তাকে ছাড়ল না তেমনি জোরে ধরে রইল তাকে। রক্ত পড়ছে টপ টপ করে।

মিলির চোখ দুটো বন্ধ হয়ে গেল। মাথাটা ঝুলে পড়ল সামনের দিকে সে অজ্ঞান হয়ে গেল।

জ্ঞান আসতে সে দেখলো নরম আরামদায়ক বিছানায় শুয়ে আছে। তাকে নাড়াচাড়া করতে দেখে একজন বৃদ্ধা তাড়াতাড়ি ঘরের বাইরে গিয়ে একবাটি গরম সুপ নিয়ে এলো। একটা চুমুক দিয়ে সে বুঝতে পারল ভারী সুস্বাদু আর উপাদেয়। ক্ষণিকের জন্য এই পরিস্থিতি সে ভুলে গিয়ে সুপের বাটি খালি করে দিল।

তিন দিন তাকে কেউ আর বিরক্ত করল না। শুয়ে বসে সময় কাটিয়ে দিল সে। আর চারবেলা এমন মুখরোচক খাবার খেলো যে, সে জীবনে কোন দিন চোখেও দেখেনি। তিন দিনে সে চাঙ্গা হয়ে উঠলো। এখান থেকে সে পালাবে, না আরও দুটো দিন দেখবে, বুঝতে পারলোনা সে।

চতুর্থ দিনে অশোক তাকে ডেকে পাঠাল। আবার কি সে, তাকে কাটাছেড়া করবে নাকি? অশোক মদ খাচ্ছিল। তাকে হাতের ইশারায় একটা টুল দেখিয়ে বসতে বললো।

মিলি বসল না। তেমনি দাড়িয়ে রইল।

আর ভয় পাবার কিছু নেই। তোমার গায়ে আর ছুরি চালাব না! রক্ত দেখলে আমি যে কি আনন্দ পাই, এটা তুমি ধারণা করতে পারবে না। মানুষ সঙ্গমের চরম পুলকিতে যে আনন্দ পায় রক্ত দেখলে আমারও সেই দুঃস্বহ আনন্দ হয়। কিন্তু আমার এই আনন্দের ব্যবস্থা আছে। আমার কুড়ি বছর বয়স্কা স্ত্রী। অন্য কোন উপয়ে আমি তার কাছ থেকে কোন আনন্দ পাইনি! তিন বছর হল আমাদের বিয়ে হয়েছে। সপ্তাহে দুদিন আমি রক্ত দেখি। কখনো বুক কাটি, কখনও বা পেট! তেমনি তার আবার যত্নও নিই প্রচুর—পুষ্টিকারক খাবারও খায়। তাতে রক্তটা আবার তাড়াতাড়ী তৈরী হয়। এর আগে দুটো ঝি ওকে নিয়ে পালাবার চেষ্টা করেছিল। তাদের কি অবস্থা হয়েছে তুমি আমার স্ত্রীকে জিজ্ঞাসা করতে পার।

গ্লাসে শেষ চুমুক দিয়ে অশোক দাড়াল। এসো আমার স্ত্রীর কাছে তোমায় নিয়ে যাই।

রীণা একটা চেয়ারে বসেছিল, স্বামীকে দেখে উঠে দাড়াল।

অশোক তাকে মাথা নেড়ে বসতে বলল। এই তোমার দাসী—কোন ষড়যন্ত্র করার চেষ্টা করো না। একে আমি সব বলে দিয়েছি। পরিনতি ভাল হবে না।

অশোক তাকে সাবধান করে দিয়ে চলে গেল।

সারাদিন কাজের পর তাকে একটু অবসর দেয়া হয়। বাগানে পায়চারী করে অথবা মনিবপত্নি রীনার অকাল পক্ক কেশ তুলে সে

সময়টা কাটায়। রোববার। অশোক সকাল থেকেই বাইরে। রাত ন'টায় ফিরবে। রীনা সবে বাথরুমে ঢুকেছে। করিডোর পেরোবার সময়, সামনের বাগান থেকে একটা অনুচ্চ শিস-ধ্বনি শুনলো মিলি। তরুন সেই মালিটা তাকে ডাকছে। তরতাজা দেহের সুদর্শন এক তরুন এখানে আছে। মিলি ভাবলো, যুবকের কোনো কুদৃষ্টি তার ওপর নিপতিত হয়েছে অনেক আগেই।

ঃ কি ব্যাপার! ডেকেছো? চেরী ব্লসমের ঝোঁপের আড়াল করে দাঁড়িয়েছে মিলি। সদ্য বাথরুমে কাপড় কাঁচছিলো সে। ধবধবে সাদা বেলুনের মতো পুরুষ্ট পায়ের গোছা ও পায়ের পাতায় সাবানের অযস্র ফেনা। তরুন মালী তাকে হাত ইশারায় পাশে বসতে বললো। মিলি চাপা ঝাঁঝে বললো,

তোমার পাশে বসার জন্য আসিনি। কি বলবে, ঝট্‌পট্‌ বলো।

ছেলেটা উঠে দাঁড়ালো। নগ্ন বুক পেট—নোংরা ধুতি পরা। ওকে মালি ভাবতে হোচট খায়! সে চারদিকে সন্তর্পনে দৃষ্টি ঘুরিয়ে মিলির দেহ ঘেঁষে ঘনিষ্ঠ হয়। ফিস্‌ফিস্‌ করে বলে,

কোথা থেকে ধরা খেয়েছো বলোতো?

আর কিছু বলবে? মিলির কণ্ঠ রুষ্ট,

না। তবে তোমার পাশের ঘরেই তো থাকি আমি। ইচ্ছে হলে—রাতে দরজাটা খুলতে পারো। কথা বলা দরকার।

ঃ কি কথা? এখন বলো! মিলি অতীত অভিজ্ঞতায় বেশ ঝানু হয়ে গেছে। পাকা মন-বিশ্লেসকের দৃষ্টিহানে সে যুবকের চোখে। ত্বরিৎ বেগে সরে যায়। নিশ্চয়ই এ বদমাশের কোন কুমতলব আছে।

সোমবার বিকেলেও তার সঙ্গে বাগানে দেখা হয়ে যায় মিলির। এইটুকুর মধ্যে মিলি জেনে নিয়েছে ওর নাম কানু। বন্যায় ডোবা, সর্বহারা দেশের লোক। ছ'মাস হলো, সেধেই কাজ নিয়েছে এখানে।

মিলি ড্রয়িং রুমের ফ্লাওয়ার ভাসের জন্য কয়েকটি তরতাজা গোলাপ ছিড়ছিলো। কানু কাজের মাঝে বললো,

রাত তিনটায় তোমার দরজায় ধাক্কা দিয়েছি। পাঁচ ছ'বার টোকা মেরেও কাজ হয়নি। হয়তো ঘুমিয়ে ছিলে।

ঃ হ্যাঁ, ছিলাম।

তোমার কষ্ট আমি বুঝি মিলি।

তাতে তোমার কি?

ঃ আমার অবশ্য কিছুই নয়। তবে তোমাকে উপকার করাটা আমার কর্তব্য।

কর্তব্য! একটা মালীর মুখে, কর্তব্য জ্ঞানের কথা এই প্রথম শুনলো মিলি। ভীষণ হাসি পাচ্ছিলো তার। বেশ গালভরা বোলচাল ঝাড়তে জানে ছোকড়া। ফুল নিয়ে ঝট্‌পট্‌ পা বাড়ায় মিলি।

রাতে শুয়ে কিছুতেই ঘুম পাচ্ছিলো না ওর। দুর্বিসহ জীবনের এই কয়েকটা রাতই অবশ্য তার ভালো কাটছে। দিনের বেলাতেও আজ ক'দিন কাটা ছেড়া চলছে না। হয়তো অশোক তাকে খাইয়ে দাইয়ে অপারেশান লেবরেটরীর গিনিপিগের মতো নাদুস নুদুস করছে। কবে না জানি ডাক পড়ে। ব্লাউজের ভেতর থেকে ছুটা পিল মুখে ফেলে চোখ বন্ধ করে থাকে মিলি। এ ঘরের বাতিটা সে নিভিয়েছে কিন্তু তবু আলোর বিরক্তি। কানুর রুমের সঙ্গে তার রুমটার পউরের ব্যবধান মাত্র একটা আড়াই ফিট প্রস্থের নেটের পার্টিশান। চৌকির উপর দু তিনটে বালিশ ফেলে, কানুর ঘরের বাতি জ্বালার কোন একটা কারণ হয়তো সে খুঁজে পেতে পারে। মিলি করলোও আসলে তাই। কি অবাক অশিক্ষিত নির্বোধ কানু ইংরেজীতে ডায়েরী লিখছে। নেট ধরে শরীরের ভার রাখতে গিয়ে শব্দ হয়। কানু এদিকে তাকায়। ডুব দেয় মিলি। চুপচাপ শুয়ে পড়ে। কিন্তু ঘুম আসেনা কিছুতেই।

রাতে রীনার ঘরে চাপা আর্তনাদ উঠে। খুট্ করে পাশের ঘরের বাতি বন্ধ হয়। মনে হলো খসমস শব্দে—খুব সন্তর্পণে কানু অন্ধকার কড়িডোরে বেরিয়ে এলো। মিলিকে এসব খুব বেশী ভাবিয়ে তুলতে পারেনা। সে শুয়ে চোখ বন্ধ করে থাকে! শরীরটা বিবশ লাগছে। জ্বলছে চোখ। আর দুটো পিল মুখে ফেলে ঘুমুতে চায় মিলি। এর পর দু'দিন মালী ছোকড়াটা ছিলো না। তৃতীয় দিনে সে এসে কাজে লেগে গেছে। ফুল তুলতে গিয়ে, বিকেলে মিলি নিজেই শুধালো.

ঃ কোথায় ছিলে এ দু'দিন?

গ্রামের বাড়ীতে। মা'র কঠিন অসুখ করেছে। দেখে এলাম।

ঃ তোমার দেশ কোথায়?

ঃ আসলে এখন কোন দেশ নেই। থাকি পাঁচকড়ি গ্রামে। আমার মা সেখানেই এক ডাকসেটে লোকের বাড়ীতে ঝিঁ খাটে। অবশ্য ইনি আমার সৎমা! মিলি হঠাৎ প্রশ্ন করে বসে,

তুমিতো লেখাপড়া মন্দ করোনি! কি বলো?

কে বললো? সন্দিহান সন্ধানী দৃষ্টি ফেলে কানু মিলির মুখের ওপর। মিলি একটু হেসে বলে.

আসলে এটা আমার আন্দাজ!

আন্দাজের কারণটা কি?

ঃ কেন, শিক্ষিত বেকার ছেলেরা কি আজকাল কুলি, রিক্সাওলা হচ্ছে না?

তা হচ্ছে। তবে আমার ধারনাটাই সত্যি হলো সেদিন রাতে তুমি চুপি চুপি আমাকে ডায়েরী লিখতে দেখেছো। মিলি ছলচাতুরী না করে স্পষ্টই বললো,

ঃ ইংরেজী তেমন বুঝি না আমি—তবে ভালো ইংরেজী জানো তুমি। শিখলে কোথায়?

ঃ সে সবই বলবো তোমাকে।

বলো।

না এখন নয়। গভীর রাতে দরজা খোলা রেখো। কঠিন শর্ত ছাড়া বলা যাবে না। মিলি সকৌতুকে বললো.

ঠিক আছে। আজ ঘুমিয়ে পড়লে, দেখা যাবে।

কানুর অন্ধকার ঘরে ফিস্ ফিস্ করে আলাপ হচ্ছে দু'জনার। রাত তিনটে। একঘণ্টা ধরে মিলিকে এই ঘরে নিয়ে এসেছে কানু। সিমেন্টের মেঝে পাশাপাশি বসে আছে ওরা। দু'জনাই দেয়ালে ঠেস দিয়ে আছে। কানুর হাতের বিড়িটায় শেষ টান দিয়ে, মেঝে ঘষে ফেললো সে সেটা।

আসলে আমার এই যৌবন আর নিরাপত্তাহীন জীবনটাই হয়েছে আমার কাল। বুঝলে? কানু বললো,

সে যাই হোক। আমি তোমাকে আবারও বলছি, বিশ দিনের মধ্যে এ বাড়ী ছেড়ে পালিয়ে যাও তুমি!

আমি বুঝতে পারছি না কানু! বার বারই তুমি আমাকে ঠিক বিশ দিন কথাটা শোনাচ্ছো কেন?

ঃ তুমি যখোন আমারই লোক হয়ে গেছো, বলতে আপত্তি নেই— বাড়ীটা রেড হবে।

আচ্ছা কানু—

বলো।

আমার ইতিবৃত্ত সবই তো বলতে গেলে শুনলে তুমি। একটা পথ বাৎলে দিতে পার?

কি পথ?

ঃ সুন্দরভাবে মানুষের মতো বাঁচবার পথ।

আজ নয় মিলি, আর একদিন বলা যাবে। ভোর হয়ে আসছে।

এবারে যাও তুমি !

ঃ তোমাকে আর একটি প্রশ্ন করতাম ?

ঃ করো !

কথার মাঝে এক সময়ে বললে, আমার জন্য তোমার যে বিশেষ সমবেদনার উদ্রেক হয়েছে—এটা সত্যিই অস্বাভাবিক। এটা কেন বলেছো।

ঃ তোমার প্রফেশান অনুযায়ী এটা বেমানান। তাই বলেছি।

কেন, সি, আই, ডি, রা দয়া মায়া করতেও পারবে না ?

ঃ কাজের খাতিরে, কাজের জন্যই পারবে। সংযত, পরিমিত ও স্বাভাবিকটুকুন মাত্র।

ঃ আমার জন্য তোমার বেদনা বোধটা অস্বাভাবিক বেশী। তাই নয়কি ?

ঃ মনে হচ্ছে ?

কেন মনে হচ্ছে ?

অতোটা বিশ্লেষণ করে দেখিনি। তবে তোমার অতীত জীবন থেকে হয়তো সেটা জানানো যায়—

ঃ আমাকে জানাতে হবে।

কখোন ?

স্মৃতির সব কথা ভালোভাবে খুঁজে পেলেই। এবারে ওঠো। বাইরে কাক ডাকছে। কলতলা গিয়ে কাজে বসতে দেরী করলে আবার তোমার পিঠে চাবুক পড়তে পারে। মিলি বেরিয়ে যেতে যেতে একটা ক্ষুদ্র শ্বাস বুকের তলে চেপে মনে মনে বললো—এই জ্বালাময় জীবনে এই একটি মাত্র রাত কাটলো বিশেষভাবে ! একজন ভালো মানুষের সঙ্গে. নির্বিঘ্নে, নির্ঝঞ্ঝাটে। হায় ভগবান, ঠিকই এখনো তুমি ধরাপৃষ্ঠে কিছু ভালো মানুষ রেখেছো, নয়তো ধরাটাই রসাতলে যেতো। মিলি কিছুটা

অবাক হলো, এই কানুর চেহারাটা কেমন যেনো পরিচিত মনে হয়—কে জানে, না দেখা লোককেও এমন মনে হয়—এটাও হয়তো তাই।

সকাল সাড়ে আটটার দিকে একটা চাকর এসে জানালো মালিকের ঘরে মিলির ডাক পড়েছে। এমন আশঙ্কাতেই সে দুলছিল ক'দিন থেকে। বুকটা তার কেঁপে উঠলো। দেরী হলে বিপদটা দ্বীগুণ হয়ে দেখা দেবে। তাই ঝট্‌পট্‌ সে হাজির হলো। কিন্তু না, তার সন্দেহটা অমূলক। বিছানার মাঝে চোখ মুদে লেপমুড়ে শুয়ে ছিলো। রীনা মিলির উপস্থিতিটা টের পেয়ে সে চোখ না খুলেই কাতর স্বরে, হাত ইশারায় রীনার পাশে বসতে বললো মিলিকে। মিলি বসে, তার কপালে হাত রেখে, শুধালো

ঃ দাদাবাবু কোথায়? বাথরুমে কি? মুখ নেড়ে রীনা বোঝালো সে এখন ঘরে নেই।

ফিরতে দেরী কি?

ঃ তাও জানিনা বোন! রীনা হঠাৎ মিলির হাত ধরে ঝর ঝর করে কেঁদে ফেললো। কি হয়েছে জানতে চাইলো মিলি। রীনা তার লেপটা সরালো। সম্পূর্ণ উদোম দেহে মনিব পত্নী রীনা শুয়ে আছে। আঁৎকে ওঠে মিলি। রীনার বুক, পেট, স্তন জোড়াতেও ক্ষত চিহ্ন। রক্তাক্ত রীনা পাশ ফিরে শুয়ে, ককিয়ে বলতে লাগলো,

আজই এখান থেকে পালিয়ে যা রাধা। আজ তোকে ধরলে সে আর জ্যান্ত রাখবে না! মিলি দেখলো, রীনার পিঠ্‌টাও রক্তাক্ত ক্ষতে ঝাঁঝরা। সেখানে হাত বুলাতে বুলাতে মিলি প্রশ্ন করে,

ঃ এসব করে কেনো দাদাবাবু? রীনা কথাটা যেনো শোনেনি। বললো,

পায়ের নীচে থেকে লেপটা তুলে দ্যাখ্‌! মিলি অবাক হলো—পায়ের পাতা, উরু, জংঘা কোথাও আর বাদ নেই। বালিশ—পিটের

তলার চাদর সবই রক্তাক্ত। এমনকি পা দিয়ে এখনো তাজা রক্ত চোয়াচ্ছে। মিলি তার শশ্রূষা করতে করতে আরো কিছু জানতে চেয়েও ব্যর্থ হলো। হয়তো রীনা বেদনার্ত শরীরে প্রলেপ পড়ায় এখন অসাড় হয়ে চোখ মুদে নির্বাক হয়ে পড়ে আছে। পায়ের কাছেই পড়েছিলো ছায়া, ব্রা ও ব্লাউজ। মিলি সেগুলো তার শরীরে গড়িয়ে দিলো। অষুধ-পথ্যে থাবার টেবিল ভরা। ওগুলো খাওয়ালো মিলি তাকে। কানুর কথাটাই হয়তো সত্যি। লোকটা ব্লাড বাঙ্কার দলের লোক। বিকৃত কাম, রক্ত চোষা নেশার লোক। কানু বলেছে, লোকটা গুপ্ত রক্ত শোষক দলের সর্দার ছিলো। কোনো কারণে, তাকে দল থেকে সাময়িক ছাটাই করা হয়েছে। রক্তের নেশাটা তার আরো বেড়ে গেছে। অশোকের ওপর ব্লাড বাঙ্কার দলের যেমন সতর্ক গোপন চোখ রয়েছে তেমনি পুলিশি তল্লাসী চলছে। আদিতে সেক্স মেনিয়াকের এই লোকটি কুসংসর্গে পড়ে, ব্লাড ভায়োলেন্স টেণ্ডেন্সীর মানুষ বনে গেছে। এই কয়েকটা মাসে এই পরিবারের আরো কিছু গোপন ব্যাপার স্যাপার জানতে পেরেছে মিলি। কানু হয়তো জানেনি, কেন মিলির প্রতি তার এতো সংবেদনশীলতা রয়েছে আর মিলিও জানেনা, সে কেনো রীনাকে দরদী চোখে দেখে।

আর ক'দিন পরেই অশোক পুলিশি রেডে পড়বে। কিন্তু তবু যেনো রীনার এই পোড়া ভাগ্যটাকে আর সহ্য করতে পারেনা মিলি। মিলি কি কিছু একটা করে বসবে? নিজের জন্য ওর আর তেমন কোনো দুঃখ নেই। কানু সাবধান করে দিয়েছে—এই সময়ে কিছুতেই যেনো শান্ত জলে নাড়া না পড়ে। আধঘণ্টা পর রীনা চোখ খোলে। মিলি রীনাকে বলল, আপনি আমাকে চিঠি লিখে দিন, আমি আপনার মার কাছে সেটা পৌঁছে দেব। আপনার মা আপনাকে এখান থেকে উদ্ধার করে নিয়ে যাবেন।

এমন অসম্ভব চেষ্টা তুমি করো না মিলি। এখান থেকে পালানো সম্ভব নয়।

আপনি আমাকে চিঠি দিন। রাত গভীর হলে পিছনের পাঁচিল টপকে আমি পালিয়ে যাব।

ঃ অত উঁচু দেওয়াল, তুমি টপকাতে পারবে না। ধরা পড়লে অশোক তোমাকে মেরে ফেলবে। আর এ বাগানেরই এক পাশে তোমাকে পুঁতে ফেলবে, যেমন এর আগে অন্য এক দাসীর ভাগ্যে এ রকম শাস্তি জুটেছিল একদিন।

ঃ মরি মরব। কিন্তু আমি আপনার এত কষ্ট আর সহ্য করতে পারছি না।

শেষ পর্যন্ত রীনা চিঠি লিখল তার মার কাছে। চিঠিটা মিলিকে দিয়ে সে আবার বলল,—আমি তো জানি আমার ভাগ্যে কি আছে। আমি অশোকের চতুর্থ পত্নী, আমার মৃত্যুর পর সে আবার অন্য মেয়েকে বিয়ে করবে। কিন্তু আমার জন্যে তুমি এমন বেঘোরে প্রাণ দিতে যাচ্ছ কেন?

কিন্তু মিলি তার কথা শুনল না। চিঠিটা জামার নিচে রেখে রাত্রির অপেক্ষা করতে লাগল সে।

রাত্রিবেলা সারা বাড়ি যখন নিঃশব্দ। দরজাটা খুলে আস্তে আস্তে সে বাগানে এলো। দেওয়ালের চার পাশে ঘুরে বেড়াল সে। অত উঁচু দেওয়াল টপকাবার সাধ্য তার নেই, ইচ্ছে থাকলেও। অনেক ভাবল সে, অনেক চেষ্টা করল। মিসেস রীনা চৌধুরীর ঘরের দরজা বন্ধ তাই সেখানে তার ফিরে যাওয়ার উপায়ও নেই এখন।

অশোকের রাত্রে ঘুম হয়নি। শেষ রাত্রে বাগানে বেড়াতে এসে মিলিকে দেখে ফেলল সে।

ঃ তুমি এখানে? তা তুমিও পালাবার চেষ্টা করছ? দাঁতে দাঁত ঘষে অশোক বলল, বিশ্ব সঘাতকতা? এসো, তোমাকে মজা দেখাচ্ছি।

সে তাকে টানতে টানতে নিয়ে গেল বন্দি ঘরে। দেখি চিঠি। আমি জানি রীনা তার মা'র কাছে চিঠি পাঠিয়েছে।

আপত্তি কোন টিকবে না, সে কথা মিলি বেশ ভাল করেই জানে। তাই সে তার জামার ভেতর থেকে চিঠিটা বার করে অশোকের হাতে তুলে দিল।

তবু তোমাকে রেহাই দেবনা। তোমার শরীরের সব জায়গা থেকে আমি রক্ত বার করব, দিনে তিনবার। আমার পরীক্ষা করে দেখবার ইচ্ছে, এতে মানুষ কতদিন বাঁচে।

অশোক তার জামার পকেট থেকে চাবি বার করে বন্দি ঘরের দরজা বন্ধ করছিল। ঠিক সেই সময় হঠাৎ কানু দৌড়ে এসে বলল,—শীগ্‌গীর আসুন, আপনার স্ত্রী মারা যাচ্ছেন। তিনি আপনার সঙ্গে শেষ কথা বলে যেতে চান।

তালায় তেমনি চাবি আটকে রইল। অশোক তাড়াতাড়ি বাগান পেরিয়ে বাড়ীর মধ্যে ঢুকল। দরজাটা বন্ধ করতে ভুলে গেল সে। কানু মিলিকে একটানে বের করে দিয়ে নিজের কাজে গেলো।

মিলি লোহার দরজা ঠেলে বেরিয়ে এলো। দৌড়াল সে গেটের দিকে। মালি সবে গেটটা খুলেছিল। মিলি বুড়ো লোকটাকে ধাক্কা দিয়ে চিৎ করে ফেলে দিল। তারপর ছুটতে শুরু করে দিল সে।

রাস্তায় লোক চলাচলা করতে দেখে সে এবার হাঁটতে শুরু করল।

প্রায় পাঁচ মাইল পথ হেঁটে এসে একটু জিরিয়ে নিল মিলি। তার পর আবার সে হাঁটতে লাগল।

বিকেলের দিকে বারুইপুর স্টেশনে এসে সে একটু নিরাপদ বোধ করল। নিশ্চিন্ত মনে এদিক ওদিক ঘুরে বেড়াল কিছুক্ষণ। তারপর ঢুকল একটা হোটেলে। এখানে সে কিছু সস্তায় খাবার নিয়ে খেতে বসল।

সাদা পোষাক পরা একটি ছোকরা তার সামনে এসে একটা চির-

কুট রাখল তার টেবিলের ওপর ।

মিলি চিরকুটটা হাতে তুলে নিয়ে দেখল সেটা একটা ছোট চিঠি। একদিন যে তোমার ওপর ঘোরতর অন্যায় করেছিল, সে আজ অপরাধ স্খলন করছে। হঠাৎ রাস্তায় সে তোমাকে দেখে চিনতে পেরেছে। দয়া করে পত্রবাহকের সঙ্গে এসো !

মিলি ছেলেটিকে বলল. নাম, না জানলে সে ওর সঙ্গে যাবে না। মিঃ হায়দার, সোমেন হায়দার—এই শহরে বর্তমানে সব চাইতে বড় ব্যবসায়ী এক বিরাট ধনী। তিনি আপনার জন্যে অপেক্ষা করছেন।

মিলি এক মুহূর্ত কি যেন ভাবল। সত্যিই হয়তো সোমনে অনুতপ্ত তা না হলে এমন চিঠি কেনই বা সে লিখতে যাবে ?

তাই সে ছেলেটির সঙ্গে গেল। প্রায় একটি প্রাসাদ বললেই হয় সোমেন হায়দারের বাড়ী।

ওর ঘরে মিলিকে পৌছে দিয়ে ছেলেটি চলে গেল। সোমেন একটা বিরাট চেয়ারে বসেছিল।

এসো মিলি। সোমেন তাহাকে আহবান করে চিয়ারে বসতে বলল। তারপর সে তাহাকে বলল, আমি সেদিন ভারী অন্যায় করেছিলাম তোমার ওপর। কিন্তু যত বয়স হচ্ছে, আমার বাসনা ততই যেন বাড়ছে। দরিদ্রসংসার এবং বস্তী থেকে আমি একটা করে যুবতি মেয়ে নিয়ে আসি। তাকে একমাত্র উপভোগ করে তারপর বিক্রি করে দিই বেশ ভাল দামেই। বাইরে মেয়ে চালান হয় জান তো। দু'দিক দিয়ে আমার লাভ হয়। কাম চরিতার্থ করা আর সেই সঙ্গে অর্থ প্রাপ্তিযোগ। সোমেন হাসল। মেয়েরা কেনই বা আসবে না বল ? ভাল খেতে পরতে পারে সেই সঙ্গে থাকবে আরামে।

: কিন্তু আপনি আমাকে ডেকেছেন কেন, তাই বলুন।

তোমাকে আমি একটা সুযোগ দিতে চাই। বছরে বিশ পঁচিশ

হাজার টাকা রোজগার করবার একটা সুযোগ আমি তোমাকে দিতে চাই।

: কি ভাবে?

তুমি বুদ্ধিমতী, সুন্দর। আমি তোমাকে জায়গা দেখিয়ে দেব। তুমি পটিয়ে তাদের আমার কাছে নিয়ে আসবে। এই হোল তোমার কাজ।

: আমি দুঃখিত, এমন জঘন্য কাজ আমার দ্বারা হবে না। বিশ পঁচিশ হাজার কেন লাখ টাকা দিলেও পারবো না।

: বেশ তা হলে যাও। তবে এ ব্যাপারে কারো কাছে যদি মুখ খোলো তাহলে একেবারে খতম করে দেব, মনে রেখো।

হঠাৎ মিলির সব রক্ত যেন মাথায় উঠে গেল। কিন্তু সেদিন আপনি আমাকে অজ্ঞান করে যে টাকাটা আমার কাছ থেকে চুরি করেছিলেন সে টাকাটা আমাকে ফেরৎ দিন। আপনার তো অগাধ টাকা। তাছাড়া আমি এখন টাকার অভাবে অনাহারে আছি।

তা তুমি তো এ টাকাটা স্বাচ্ছন্দে রোজগার করতে পার মিলি। অবশ্য যদি তুমি চাও। তোমার যা চেহারা অনেক বেশী টাকা উপার্জন করতে পার।

: না, হাজারবার না।

শোনো মিলি আমার কথা। আমার কথার অবাধ্য হয়ো না। আমার কথা শুনলে তোমার কোন অভাব থাকবে না। তাছাড়া আমার কাছে তুমি তো আর কুমারী নেই। আমাকে দিতে তোমার লজ্জাটা কিসের। সেদিন আমি জোর করে নিয়েছিলাম। কিন্তু আজ তো আর জোর করে নিতে যাচ্ছি না। উপযুক্ত পারিশ্রমিকও তুমি পাবে। কেনই বা আপত্তি করছ তাহলে?

মিলি কি উত্তর দেবে এই নোংরা লোকটার প্রশ্নের? সে ততক্ষণে তাকে ধরে ফেলেছে। কিন্তু মিলি আজ সেই দুর্বল মেয়েটি নেই। সে এমন ধস্তাধস্তি শুরু করে দিল যে, শেষ পর্যন্ত সোমেন তাকে

ছেড়ে দিতে বাধ্য হল।

রাস্তায় এসে মিলি ভাবল, লম্পট পুরুষদের কাছে তার প্রথম জয়।

ইস্পাত নগরী দুর্গাপুরে চাকরির অভাব হয় না, মিলি শুনেছিল। এক রকম বিনা টিকিটে সে রেলওয়ে চেকারের দৃষ্টি এড়িয়ে দুর্গাপুর এলো। ষ্টেশন থেকে বেরিয়ে পথে নামতেই এক বৃদ্ধ তার পথ আটকাল। কিছু ভিক্ষা চাই। সে তো নিজেই একজন ভিক্ষুক। তবু তার দয়া হল। মিলি তার ভ্যানেটি ব্যাগ খুলে পয়সা দিতে যাবে, রুগ্ন ভগ্নস্বাস্থ্য বৃদ্ধাটি এক ঝটকায় তার হাত থেকে ব্যাগটা কেড়ে নিল। সঙ্গে সঙ্গে সে মিলির পেটে আচমকা ঘুষি মারল। মিলি পেটে হাত দিয়ে রাস্তার উপর বসে পড়ল। ওদিক থেকে বৃদ্ধা উধাও।

খানিক পর সামলে নিয়ে উঠে দাঁড়াল মিলি। তারপর সে হাঁটতে শুরু করল। মিলি কিছুই বুঝতে পারলো না ভগবান কেন তাকে এত কষ্ট দিচ্ছেন। সে তো কোনো অপরাধ করেনি।

দুর্গাপুরে তেমন কোনো সুবিধে করতে পারলো না সে। এবার সে আসানসোলের পথ ধরল।

আসানসোলে শহরের নির্জন কোলিয়ারের পথ!

দূর থেকে সে দেখতে পেল, দু'জন গুণ্ডা প্রকৃতির লোক একজন লোককে বেদম প্রহার করছে। তার আর এগোতে সাহস হল না।

লোকটি পড়ে রইল মাটিতে। গুণ্ডারা চলে গেল তাকে ফেলে।

মিলি লোকটার কাছে গেল। সে তখন প্রায় বেহুঁস। কাছের একটা হোটেল থেকে জল নিয়ে এসে মিলি জলের ঝাপটা দিল তার চোখে মুখে! কয়েক মিনিটের মধ্যেই লোকটির নিঃশ্বাস সহজ হয়ে এলো। মিলি তার মাথার নিচে হাত দিয়ে তাকে বসিয়ে দিল। জল খাওয়ালো।

লোকটির পরণে মূল্যবান পোষাক—ভদ্র চেহারা, সে তাকে জিজ্ঞেস

করল, কে তুমি ?

আমি এক হতভাগিনী, বলল মিলি। উদ্দেশ্যহীন পথ চলছিলাম চাকরীর সন্ধানে। হঠাৎ দূর থেকে দেখলাম দুটি লোক আপনাকে মারছে।

তারপর এক অপরিচিত লোকটিকে মিলি তার দুঃখের কাহিনী সবিস্তারে বলল।

সব শুনে সে বলল, আমার নাম মিহির বোস। দূরে একটা কোলিয়ারির কাছে আমার বাড়ী—বিয়ে করিনি। আমার একটি বোন ছাড়া বাড়ীতে আর কেউ নেই। তুমি যাবে আমাদের বাড়ী ? গেলে আমার বোনের একজন সঙ্গিনী হয় তাহলে। তোমাকে তার খুবই পছন্দ হবে। যাবে, যাবে তুমি আমার সঙ্গে ?

মিলি হঠাৎ এমন একটা আশ্রয় পেয়ে হাতে চাঁদ পেয়ে গেল যেন। আপত্তি করল না সে এবার আর।

তারা হাঁটতে শুরু করে দিল।

পথে যেতে যেতে অনেক গল্প করল তারা। ঐ দুটি লোকের কাছে মিহির নাকি টাকা পায়! আর সেই টাকা ফেরৎ চাইতেই তারা নাকি তাকে মারতে শুরু করে দিল। টাকা ফেরৎ দেওয়ার বদলে প্রহার। দেখলে কাণ্ডটা! রাত্রির আগেই আমাদের কোথাও আশ্রয় নিতে হবে। আমার বাড়ী অনেক দূরে আজ রাত গভীর হওয়ার আগে পৌছান সম্ভব নয়।

ওরা জি, টি, রোডের উপর একটা হোটেলে আশ্রয় নিল। একসঙ্গে রাত্রির খাবার খেয়ে ওরা আলাদা ঘরে শুতে গেল; বেশ সুখেই এবং নিরাপদে এই প্রথম রাত কাটাল মিলি। এই লোকটাকে ওর ভালোই লাগলো। পরদিন ভোরবেলা মিলির ঘুমটা আগেই ভাঙ্গলো। হোটেলটা বেস সুন্দর। দ্বীতল, ও বেশ ছিমছাম। দোতালার ব্যালকনিতে হাত রেখে, মিলি দেখলো নীচের বাগানটা বেশ সুন্দর। চমৎ

কার সব সিজন ফ্লাওয়ার ও ক্যাকটাসের ফুলগুলো বেশ লাগছে। নিচ থেকে ঘুরে আসবে নাকি মিলি একটু খানি? পাশের কামরার পিপিং হোলে চোখ রাখলো মিলি—মিহির বোস নামের লোকটা পড়ে পড়ে নাক ডেকে ঘুমুচ্ছে এক ধরণের লোক আছে যারা নিয়মিত রাত জাগে এবং ভোরে শুতে গিয়ে মোষের মতো ঘুমোয়। একেও সেরকমের মনে হলো।

ভোরের স্নিগ্ধ ফুরফুরে হাওয়াটা গায়ে লাগছে। অনেকদিন পরে যেনো মিলি সকালের সৌরভটা সারা অঙ্গে মাখতে পারলো। লোহার কার্ভিসিড়ির ল্যাণ্ডিংস-এ পায়ে পায়ে পা ফেলে নীচে নেমে এলো সে। দু'একজন বোর্ডার উঠে, চোখ কচলাতে কচলাতে টয়লেটে ছুটছে—এছাড়া সমস্ত ইয়ার্ডটাই নির্জন। ফুল বাগানে বেড়াতে বেড়াতে হঠাৎ একটা সিটি শুনে, চারদিকে চোখ ফেলে মিলি, কে যেনো বকাটে ছোকড়াদের মতো. আঙ্গুল মুখে পুরে আবার সেটি বাজাচ্ছে। লোহার গ্রিলিং গেলে চোখ জোড়া থমকে যায়—একটা ভিখেরী দাঁড়িয়ে আছে! চোখটা নেয় মিলি অন্যত্র। আবারও সিটি বেজে ওঠে। কাউকেই দেখেনা মিলি। আবার গেটে চোখ পড়ে—সেই ভিখেরীটা দাঁড়িয়ে আছে—মুখে কাঁচা চাপা দাড়ি—কাঁধে ঝোলা। হাতে লাঠি ও শতছিন্ন আল খেল্লা পরা—মাথায় একটা ময়লা টুপি। লোকটার একটা পা হয়তো নেই—নয়তো বিকল বাঁশের লাঠিতে ভর দিয়ে দাড়িয়ে আছে ভিখেরীটা—স্থির দৃষ্টি তার নিবদ্ধ মিলির দিকেই।

ওর দিকে চোখ পড়তেই বিভ্রান্ত হবার পালা। লোকটা চারদিকে সন্তর্পনী চোখ মেলে, মিলিকে হাত ইশারায় গেটের দিকে ডাকছে। ভিখেরীর এ কোন ধরনের মতলব? একটু খানি ক্রোধ ও বেখাপপা মেজাজ নিয়ে ওকে দু'কথা শোনাবার জন্যই বুঝি এগিয়ে গেলো মিলি গেটের দিকে।

সাহস তো তোমার কম নয়—যাও ভাগো এখান থেকে—

মিলি।

কে! এযে পরিচিত কণ্ঠ। চমকে ভালো করে ভিখেরীর দিকে দৃষ্টি নিবদ্ধ করে মিলি, কে তুমি?

নকল দাড়িটা একটু খানি সরাতেই অস্ফুট স্বরে মিলি বলে ওঠে, কানু! তুমি!!

সময় খুবই কম! চট করে বাহিরে এসো—

: বাইরে?

হ্যা আমার সঙ্গে এক্ষুনি বেরুতে হবে তোমাকে!

মিলি ইচ্ছা অনিচ্ছার মাঝে বাইরে এলো। চলমান একটা টম্ টম্ হাত ইশারায় থামিয়ে কানু ওকে নিয়ে সেটাতে উঠে পড়ে।

কোথায় যাচ্ছি আমরা!

আপাততঃ কোনো একটা বাজে হোটেলে।

: বাজে হোটেলে—ঠিক বুঝলাম না!

: আমি তো এখোন একটা পথের ভিখেরী। তোমার সঙ্গে চলাফেরা টা দামী হোটেলের লোকেরা সন্দেহের চোখে দেখবে। অন্তত এমোন একটা হোটেলে যেতে হবে যেখানে ভিখেরীরা নাস্তা খেতে যেতে পারে অস্বাভাবিক মনে না হয়! নিশ্চয়ই এতো সকালে নাস্তা করোনি?

না!

তোমার সঙ্গের লোকটা এখোনো ঘুমুচ্ছে বোধহয়?

হ্যা। কিন্তু তুমি এতোসব জানো কি করে?

অজানাকে জানা এবং তার পেছনে ছোটাইতো আমার প্রফেসান! তোমাকে অশোকের বাড়ী থেকে বের করে দিয়ে নিজেও নিশ্চিত হতে পারিনি। কিছু পরেই আমি বেড়িয়ে পরেছি, তোমার পিছু পিছু লেগে আছি সেই তখোন থেকেই!

তাই ?

ঃ হ্যাঁ গো সুন্দরী।

অল্পক্ষনেই ওরা টম টম থেকে একটা নিম্নমানের হোটেলের সামনে নেমে পড়লো। কানুর নির্দেশে আগে আগে হোটেলে ঢুকে পড়লো একটা খালি কেবিনে মিলি। ওয়েটার এসে সেই লেডিস কেবিন থেকে ভিখেরীরূপী কানুকে উঠে অন্যসিটে যেতে বললো। খাবার তত্তোক্ষণে কানুর টেবিলে এসে গেছে। কানু লাফিয়ে তেড়ে উঠলো,

ঃ ক্যান্ ক্যান্—আমি বাইরাই যাইতাম ক্যান্ ? ভিখারী হইছি বইল্যা আমি কি মানুষ না ? উনি মেম সাব হইছে তো কি হইছে ? মুখের খাবার ফালাইয়া যাইতাম না আমি।

মিলি ঝগড়ার সামনে এসে দাড়িয়েছে ততোক্ষণে! কথার ফাঁকে কানু তাকে চোখ মারে। মিলি ওয়েটার ছেলেটিকে বলে,

ঠিক আছে ভাই! ভিখারীরাও তো মানুষ! আমি না হয় ওর সামনের চেয়ারেই বসছি—ম্যানুটা নিয়ে এসো আমি খাবার অর্ডার দিচ্ছি।

অল্পক্ষনেই খাবার শেষ করে, আগের মতোই আগে পিছে বেড়িয়ে এলো ওরা দু'জনা। একটা রিক্সা ডেকে উঠে পড়লো। রাস্তা তখোন সবে জনারন্যে পরিপূর্ণ হতে চলছে! লোকেরা একটা মেম সাহেবের পাশে বসা এমোন একজন ভিখেরীকে দেখে বার বার চোখ ফেলতে লাগলো! কানু বললো,

টেড মার্ক হয়ে যাচ্ছি! একটা নির্জন এলাকায় যাওয়া দরকার!

ঃ কিন্তু আমার তো হোটেলে ফিরতে হবে!

ঃ কেনো ?

ঃ আমার সমস্ত অরনামেন্টস্ ঐ লোকটার কাস্টডিতে রেখেছি।

ঃ লোকটাকে তোমার কি মনে হয়।

গতরাতের অভিজ্ঞতায় নিজের ধারনা শক্তিকে ভালোভাবে ঝালিয়ে

নিয়ে মিলি বলে,

ঃ নিঃসন্দেহে খুবই ভালো একজন মানুষ সে! মিলি দেখলো না, ঠিক এই সময়ে কানুর নকল গোফ দাড়ির আড়ালে একটা রহস্যময় হাসি ফুটে উঠলো। রিক্সা চলছিলো কানুর নির্দেশে। মিলির মনটা আসলে ঐ হোটেল – হোটেলের মিহির বোস এবং অলংকারের দিকে পড়ে আছে। ক্রমেই সকালের সোনালী রোদটা কড়া হয়ে উঠেছে। কিছুটা বিরক্ত বোধ করছে মিলি। আর কতোক্ষন এভাবে চলবে ওরা? ফের জিজ্ঞেস করে মিলি,

ঃ কোথায় যাচ্ছি আমরা? আর কতদূর এভাবে ছুটতে হবে?

কানু ওকে ভালোভাবে দেখলো, যেনো কানু মিলির মনের অবস্থা-টাও ভালোভাবে দেখতে পাচ্ছে। তারপর ফের গম্ভীর ও চিন্তিত হলো। মিলি কিছু একটা বলতে গেলেই—তাকে হাত ইশারায় এবং বোবা ভাষায় এটা বুঝালো যে, এখানে বেশী কথা বলাটা মোটেই নিরাপদ নয়!

তিন

মিলি মনে মনে যতোই বিরক্ত হোক—রিক্সা তবু চলতেই লাগলো। মিলি এক সময় বললো,—

ঃ আমাকে কি তুমি কোরিয়ারির পথে নিয়ে চলেছো?

ঃ হ্যাঁ!

ঃ কি কাজ ওখানে?

ঃ তোমার সঙ্গে আমার কিছু জরুরী আলাপ ছিলো।

ঃ চলতি পথেই তো বলতে পারতে—

ঃ না, ব্যাপারটা অন্য রকম কিছু।

মিলির মনটা এবারে অলংকারের জন্ত খুবই উদ্বিগ্ন হয়ে পড়লো। মেজারের নিডলটা বুঝি বিপদ সীমার বাহিরে চলে গেল। মিলি বললো,

ঃ আজকেই কথাটা কি বলা দরকার?

ঃ হ্যাঁ—আর সময় সুযোগ পাবো কিনা সন্দেহ!

একটু পরেই রিক্সাটা ছেড়ে দিলো কানু কারণ এ পথে আর রিক্সা এগুবার সম্ভাবনা নেই। উঁচু, নিচু খাড়ির পথ শুরু হয়ে গেছে। যেদিকে চোখ যায় শুধু মাঠ আর মাঠ! দিগন্ত জোড়া, জনমানবহীন, নিয়ালা সবুজ ঘনের সারি! কোলকাতার কাছেই যে এমোন একটা নির্জন প্রান্তর ও এলাকা পড়ে আছে—ভাবতেই অবাক লাগে!

কানুর পাশাপাশি হাটছে তো হাটছেই মিলি। সূর্যটা তেজময় হয়ে আরো উপরে উঠেছে। রোদে পিঠের ব্লাউজহীন অংশটা চড়

চর করে পুড়ছে—কে জানে, এতোক্ষনে মিহির তাকে না পেয়ে কমোন করছে—কি ? মিলির মেজাজটা বেশ তিরিক্ষি হয়ে উঠার একটা অন্তর্হিত কারণ রয়েছে। নানাবিধ ধকুল সওয়া জীবনে—মিলি ভেবেছিলো, তেমোন কোনো এক সুজনের সাক্ষাৎ পেলে ; তাকে নিয়ে নবতর জীবন যাত্রা শুরু করবে সে। মিহিরকে পাওয়া অবধি সেই বাসনার দানাটা অন্তরে বাঁধতে শুরু করেছে! মিলি ভেবেছিলো ভোরের দিকে সে মিহিরের সংগে এ নিয়ে একটা শলা পরামর্শে বসবে। কিন্তু সেটা আর হলোনা এই কানুর জন্যই। কানু সম্পর্কে তবু যা একটা ধারনা গড়ে উঠেছিলো মিলির অন্তরে এবারে সেটা বিলীন হতে চলেছে!

কোলিয়ারির একদম নির্জন একটা মাটির টিলার কাছে এলো ওরা। টিলাটার দিকেই ওরা এগিয়ে যাচ্ছে। মাঝে মাঝে কয়েকটা কোলিয়ারির কয়লা বেলিং পেরিয়ে গেছে ওরা—তারই লিফট চোখে পরছে মিলির। কোনোটা সচল এবং কোনোটার বা চাকা ঘুরছিলো না! এখোন যেখানে এলো ওরা, এটা মাটির টিলার ধারে একটা ঘন সবুজ পিপল গাছের নির্জন ঠাণ্ডা ছায়াময় স্থান।

কানু গাছের গুড়িতে ঢেঁস দিয়ে বসে। মিলিকে পাশে বসার জন্য বললো। অনিচ্ছা সত্বেও পাশে বসে সে। অনেক পথ হেটে, এই শান্ত পরিবেশে হাল্কা ঝিরি ঝিরি বাতাসটা বেশ লাগছিলো তার। কানু নকল দাঁড়িটা খুলে ফেলে। মিষ্টি হাসি তার চোখে মুখে।

ঃ একটা গল্প শোনাতে তোমাকে এতো কষ্ট দিয়ে—এতো দূরে দিয়ে এলাম!

ঃ কি সেই গল্প ?

ঃ গল্পটাকে মনে করতে পারো—আমার স্মৃতিময় ডায়েরীর একটা ছেঁড়া পাতা! আচ্ছা মিলি, তোমার কি মনে পড়ে আজ থেকে বহুদিন

আগের এই কোলকাতা নগরীকে? সেই চিৎপুর আর গৌরী পাড়ার কথা—দুটো প্রাচীন ঐতিহ্যবাহী বাড়ী—

একটুখানি চমকে ওঠে মিলি। ঘুরে বসে কানুর দিকে—নিরীক্ষণের চোখে তাকায় ওর মুখের দিকে। বলে,

: চিৎপুরের সেনবাড়ী? তুমি চেনো কি করে?

আল খাল্লার পকেট হাতরে একটা সিগ্রেট বের করে ধরায় সেটা কানু—একটা সজোরে টান মেরে কিছু ধোঁয়া ছাড়ে—কিছু ধোয়া বুকের মধ্যে রেখে, কাপা কাপা নিঃশব্দ নিঃশ্বাসের সঙ্গে ছাড়ে। উদাস কণ্ঠে বলে কানু,

: জানো মিলি, এ জীবনটা বড় বিচিত্র—বিচিত্র মানুষের স্মরণ শক্তি। কাউকে ইচ্ছে করেও মনে রাখা যায় না আর কাউকে চেষ্টা করেও ভোলা যায়না—যেমন আমি ভুলতে পারিনি দুটো সেনবাড়ীর কথা।

মিলির কপালের মাঝখানে লম্বা একটা ভাজ পড়ে। চিন্তিত সে। চিন্তার ঘোর নিয়েই বলতে থাকে,

গৌরীপুর সেনবাড়ীর কথাটা কবে যেনো কোথায় শুনেছি?

: হ্যা. কারো কারো মতে ওটা বদ ও বকাটে ছেলেদের আড্ডাবাড়ী

: এ কথাটাও মনে হয় আমি কখনো শুনে থাকবো!

কানু স্মৃতির পাতায় ডুবে গেছে যেনো। স্বপ্নাচ্ছন্নের মতো বলতে থাকে,

: খুব সুন্দরী দুটি মেয়ে ঠিক যেনো ফুটন্ত লাল গোলাপ রোজ ফিরু স্কুল ষ্ট্রিট দিয়ে স্কুলের পথে যায়। বড় মেয়েটার নাম মিলি, চিৎপুর সেনবাড়ীর মেয়ে সে। যেমনি উগ্র মেজাজ তার তেমনি দেমাগী। তবু বড় আকর্ষণীয়া সে। অন্ততঃ একজনের কাছে, যে ভাবতো, গোলাপ ফুলেই তো কাঁটা থাকে জবা ফুলে থাকেনা! ওকে ভালো লাগতো বলেই রোজ সেই পথের ধারে একাকী দাঁড়িয়ে থাকতো ছেলেটি।

শিষ বাজাতো না—টোল্টিং করতো না—তবু মেয়েটি তাকে ফিল্ডার ভেবে ভুল বুঝলো—এমোন কি এক সময়, কথা কাটাকাটির মুহূর্তে সে সেই ছেলেটিকে পুলিশে ধরিয়ে দিতে চায়।

ঃ হ্যা হ্যা ঠিক চিনেছি এবার! বহুদিনের অদেখা আর বহু পরিবর্তনের পর তাই তোমাকে এতো চেনা চেনা লাগতো আমার। তুমি তো সেই তুমি—যে আমাকে, ডালিং নামে ডেকে অপমান করেছিলে!

ঃ হ্যা, আর তুমি সেই মেয়ে, যে আমার বংশ মর্যাদায় আঘাত দিয়ে কথা বলেছিলে। আমি বলেছিলাম, আমার এই প্রেম যদি সত্যি হয়—তবে নিয়তিতে বিশ্বাসে এই আমি সমীর সেন বলে যাচ্ছি, একদিন না একদিন তুমি নিশ্চয়ই আমার হবে—একান্তই আমার।

মিলি একটুখানি লজ্জা পায়। বলে,

ঃ আচ্ছা সেদিন কি সত্যিই তুমি আমাকে ভালেবোসতে? না অন্য কোনো মতলব ছিলো তোমার—সত্যি করে বলো তো?

একটু ভেবে কানু নামধারী সমীর বলে,

ঃ যদি বলি, আজো তোমাকে ভালোবাসি?

ঃ মিথ্যে কথা—

ঃ মিথ্যে নয় মিলি। একবার তোমার মনকে প্রশ্ন করে দেখো, কথাটা সত্যিই কিনা? আচ্ছা, এরপর কখনো কি আমাকে তোমার বনে পড়েনি।

ঃ হ্যা, পড়েছে—

কি মনে হয়েছে তখোন?

ঃ সত্যি করে বলবো?

ঃ বলো—

ঃ বড় ঘরের একটা ইচড়ে পাকা বখাটে—রাস্তার একটা ফিল্ডারা টোল্টিং বয়

ঃ মিলি!

ঃ হ্যাঁ কানু –

ঃ আমার আসল নামটাও ভুলে গেছো দেখছি – সমীর সেন।

তোমার সেই অতীতের প্রেম রোমন্থনের জন্য কি তুমি এভাবে এতো দূরে নিয়ে এসেছো আমাকে ?

যদি বলি, আরো কিছু পাবার আশায় –

কি সেটা ?

ঃ তোমাকে আমি চিরতরে পেতে চাই মিলি –

ঃ কানু। না – না, এ হয়না – কখনো হয়না।

বিদ্যুৎ স্পৃষ্টের মতো উঠে দাঁড়ায় মিলি। সহসা তার মুখে পরিবর্তনের ছাপ দেখতে পায় কানু নামের সমীর সেন। বুঝতে পারে, আজো সে সমীরকে আগের মতোই ঘৃণা করে চলেছে। আসলে মেয়ে জাতটাই এমোন – হয়তো ভালোবাসবে – নয়তো ঘৃণা করবে – মাঝামাঝি সম্পর্ক রাখতে জানেনা। মিলি মনস্থির করে বলে,

ঃ আগে জানলে, এতোটা সময় নষ্ট করতে দিতাম না তোমাকে। চলো বড় রাস্তায় গিয়ে এক্ষুনি আমাকে একটা টেক্সি ডেকে দেবে, –

ঃ সেকি – এক্ষুনি চলে যাবে !

আগে জানলে আরো আগেই চলে যেতাম।

মিলি যাবার জন্য পা বাড়ায়। সীমার পিছন থেকে তাকে ডাকে – অসহিষ্ণু মেজাজে মিলি বলে,

কি কথা, ঝট্‌পট্‌ বলে ফেলো ?

ঃ তুমি কিন্তু আবারও ভুল করতে চলেছো ?

ঃ ভুল ! আমি করছি – না, তুমি ! যে তোমাকে স্বামী বলে কোনদিনও গ্রহণ করবে না ; তুমি তার কণ্ঠে মালা দিতে উঠে পড়ে লেগেছো কেনো বলোতো ?

ঃ হয়তো আমার প্রেম অন্ধ, তাই—

ঃ অন্ধ প্রেমে আমি বিশ্বাসী নই। তুমি কি আমাকে টেক্সি ডেকে দেবে? নাকি, একাই যেতে বলছো?

ঃ আমি তোমাকে হোটেলেই পৌঁছে দিয়ে আসবো—

ধন্যবাদ। অতোটা না করলেও চলবে! আচ্ছা আমি চলি।

মিলি হন্‌ হন্‌ করে হাটতে থাকে। সমীরের কোনো ডাকেই আর ঘুরে দাঁড়ায় না। হতাশ সমীর পায়ের গতি কমিয়ে এলোপাথাড়ি হাটতে থাকে—তার পায়ের গতি অনেকটা যেনো মাতালের পদক্ষেপের মতো।

একবার শেষে চেচিয়ে বললো সমীর,

তাহলে এ ঘটনা এখানেই শেষ? একবার শুধু সে কথা নিজ মুখে বলে যাও মিলি।

কর্কশ কণ্ঠে মিলি বলে,

ঃ যে ঘটনা শুরুই হয়নি—সে ঘটনার শেষ হবার প্রশ্ন তো ওঠেই না।

মিলি একাকী একটি টেক্সি ডেকে তাতে উঠে বসে এবং হোটেলের উদ্দেশ্যে ছুটে চলে। নিজেকে বার বার বলে, না না, এ কিছুতেই হয়না—আমার জীবন ও যৌবনের সবকিছুই আজ হারিয়ে গেছে—এই রিক্ত-শূন্য জীবনটা নিয়ে কানুর মতো একটা ভালো ছেলেকে কেনো আমি ফাঁকি দেবো—কেনো—কেনো! ও আমাকে ভুল বোঝে বুঝুক—তবু ওকে আমি স্বামী হিসেবে লাভ করতে গিয়ে ঠকাতে পারবো না। বিয়ে করতে হলে, মিহিরের মতো একটা লোক পাওয়াই আমার জীবনের জন্য অতি বড় ভাগ্যের কথা।

চার

হোটেলের দিকে ফিরতে ফিরতে খুবই ঘাবড়ে গেলো মিলি। বেলা কিছুতেই দশটার কম হবে না। মিহির নিশ্চয়ই এ্যাতোক্ষনে ঘুম থেকে উঠেছে। উঠার পরই মিলিকে খুঁজেছে। খুজে না পাওয়ার পর কি ভেবেছে সে মিলির সম্পর্কে? একটা মেয়ে বাটপার? না, তা সে ভাবতে পারে না। মিলিতো ওর কিছু নিয়ে ভেগে পড়েনি! বরং মিহিরের কাছেই গচ্ছিত রয়েছে মিলির কিছু হাল্কা অলংকার। আচ্ছা, ওসব নিয়ে কি লোকটা পালাবে?...যদি পালায়? কতো লোকই তো ভালো-বাসার নামে প্রবঞ্চনা করে? কে জানে কি আছে কপালে? না না, মিহির এমোন লোক নয়—তাই যদি হবে, তবে রাতে সে আরো কিছু করতো মিলিকে নিয়ে!

উদ্বেগ, উৎকণ্ঠা নিয়ে ঘামতে ঘামতে হোটেলের সিঁড়ি পথে উঠতে লাগলো মিলি। খুব ভয়ে ভয়ে এগিয়ে গেলো করিডোরের লম্বা প্যাসেজ বেয়ে। এমোনও তো হতে পারে যে, মিলির এই উদাউ হবার ব্যাপারটা থানা অবধি গড়িয়ে গেছে। কিন্তু হোটেলের এখানে ওখানে দেখা হওয়া বোর্ডারগুলো কেউ কিছুই জিজ্ঞেস করছে না কেনো মিলিকে?

মিহিরের কক্ষের আগেই মিলির কক্ষ! দরজাটা ভেজানো—ঠেলে ঢুকে দেখলো, যা যেমোন ছিলো, তেমনিই আছে—শুধু টেবিলের উপর একটা নাস্তার প্লেট কাগজে ঢাকা দেয়া পড়ে আছে! খুব ভয়ে এগুলো সে এবার মিহিরের দরজার দিকে। দরজাটা ভেতর দিয়ে আগের মতোই

বন্ধ করা। পিপিং উইণ্ডোতে চোখ রাখলো মিলি, কি অবাক কথা লোকটা এ্যাখোনো মোষের মতো পড়ে ঘুমুচ্ছে! মিলি ওর দরজায় ঘা মারলো! ধড়মড় করে ওঠে বসে মিহির! বলে,

ঃ কি ব্যাপার নাস্তা করেছো তো? রেডি হয়ে নাও! কোথায় গিয়েছিলে? বাথরুমে? এতোক্ষণ লাগে তোমার? আমিতো নাস্তা সেরে বসেই আছি।

মিলি দ্রুত নিজের কক্ষে ঢুকে, স্নানের মতো চুল কিছুটা ভিজিয়ে নিয়ে, নাস্তা সেরে, ঝট্‌পট্‌ রেডি হয়ে ওর সঙ্গে বেরিয়ে আসে হোটেল থেকে।

একটা টেক্সিতে ঘণ্টা খানেক চলার পর কোলিয়ারির মতো আরেকটা নির্জন এলাকায় এসে, লোকটা একটা জঙ্গলের ধারের একতলা বাংলো দেখিয়ে বলে,

ঃ এটা আমার বাড়ী!

ঃ এমন নির্জন জায়গায় আপনি বাড়ী করেছেন? এবার মিলি যেন একটু ভয় পেল। তাও জঙ্গলের কাছে?

ঃ শহর আমার ভাল লাগে না। আমি নির্জনতাই বেশী পছন্দ করি।

ওরা সেই উপত্যাকার মতো ঢালু অংশের দিকে নেমে গেল। অনেকটা ঢালু পেরিয়ে মিহিরের বাড়ী। কলিংবেল টিপল মিহির! একটা চাকর দরজা খুলে দিল। ওরা ভিতরে ঢুকতেই দরজাটা আবার তেমনি বন্ধ হয়ে গেল। দরজায় তালা দিল লোকটা! মিলির বুকটা হঠাৎ একটুখানি কেঁপে উঠল এক অজানা আশঙ্কায়। সব সময়েই দরজা বন্ধ রাখার কি মতলব?

ঃ এসো? মিহির তাকে ডাকল।

বড় হল এবং প্যাসেজ পেরিয়ে আর একটা বন্ধ দরজার সামনে মিহির থামল। দরজার বাইরে পাহারা দিচ্ছিল একটা দৈত্যাকার

নিগ্রোর মত দেখতে কালো কুৎসিত লোক। তবে দৈহিক গঠনটা অতি চমৎকার। কামুকী মেয়েদের কাছে লোভনীয় সে। লোকটা টুল থেকে সরে দাঁড়িয়ে মিহিরকে সেলাম ঠুকল। লোকটির কোমরে ছোরা আর কোমর থেকে চাবি নিয়ে সে দরজাটা খুলল। মিহির হাত ধরে তালিকে ঘরের মধ্যে নিয়ে গেল। দরজাটা আবার বন্ধ হয়ে গেল।

ঘরটাতে ছোট বড় অসংখ্য যন্ত্রপাতি। মনে হলো ছাপার যন্ত্র। পাঁচটি মেয়ে মুখ বুজে কাজ করে যাচ্ছে। জাল নোট ছাপা হচ্ছিল সেখানে।

বসে পড় মিলি। মিহির তাকে ছোট একটা ধাক্কা দিল। এরা তোমায় কাজ বুঝিয়ে দেবে। এরা সব ওস্তাদ, অনেকদিন ধরে একাজ করছে।

মিলি বলল, বিপদে আমি আপনার সেবা করেছি, আর আপনি আমাকে এমন অন্যায় কাজ করতে বলছেন? এমন কাজ করা আমার দ্বারা সম্ভব নয়। আপনি আমায় ক্ষমা করুন।

ঃ তুমি যা করেছ, তোমার তৃপ্তির জন্যই করেছ। তৃপ্তিই ছিল তোমার স্বার্থ। এটাও এক ধরণের স্বার্থপরতা। তাছাড়া, এ সংসারে ন্যায় অন্যায় সবই মানুষের তৈরী। তোমার কাছে যেটা অন্যায়, আর একজনের কাছে সেটা অন্যায় নয়। আবার এর ঠিক বিপরীতটাও সত্যি। প্রকৃতির কাছে ন্যায় অন্যায় বলে কিছু নেই। তুমি আশ্রয় খুঁজছিলে আর আমি লোক খুঁজছিলাম, এর চাইতে ভাল বন্দোবস্ত আর কি হতে পারে বল? তাই বলছি বসে পড়। লেগে যাও কাজে। বাদ দাও যুক্তি তর্ক।

না আমার দ্বারা এ কাজ হবে না।

ঃ আপনি আমায় ছেড়ে দিন। আমি আপনার কাছে আশ্রয় চাই না।

মিহির একটা শক্ত বেত টেনে নিয়ে ক্রমাগত ঘা মারল ওর হাতে

পায়ে আর পিঠে। বেতটা ঠিক জায়গায় রেখে ঘর থেকে বেরিয়ে গেল সে। দরজার কাছ থেকে মুখ ফিরিয়ে বলল, ঠিকমত কাজ না করলে এমনি বেত চলবে।

মিলি মাটিতে বসে পড়ল।

একটি মেয়ে তাকে বলল ধরা যখন সে পড়েছে, তখন তাকে কাজতো করতেই হবে। তাছাড়া কোন উপায় নেই। কাজ না করলে এমনি বেত চলবে। তাতেও যদি তার শিক্ষা না হয় তাহলে উলঙ্গ করে প্রথমে তার স্তন জোড়া এবং যৌনীর ওপর চাবুক পেটান হবে। তারপর ঐ নিগ্রোর মত দেখতে সাওতাল যুবকটিকে লেলিয়ে দেবে তোমাকে উপভোগ করার জন্যে। ওর গায়ে যা শক্তি আর ওর সেই পুরুষাঙ্গটা যা মোটা এবং দীর্ঘ, সেটা নিতে গিয়ে তোমার জীবনটা প্রায় শেষ হয়ে যাবে। তাই বলছি, তার চাইতে কাজ করা ভাল নয় কি।

সন্ধ্যার সময় তাদের ছুটি হল। ঘর থেকে বেরিয়ে এল তারা। পাহারাদার দরজায় তালা লাগিয়ে দিল।

রাতের খাবার পর যে যার ঘরে গিয়ে ঢুকল। প্রত্যেকের জন্যে আলাদা এক একটা খুপরি ঘর। লোহার খাটে একটা করে চাদর আর বালিশ। একা ঘরে বালিশে মুখ বুজে অনেকক্ষণ কাঁদলো সে নিজের জন্য। কেনো সমীরের কথা শুনলো না? সামান্য একটা গহনা এবং মানুষের আশ্রয়ের লোভে ফের এখানে ফিরে এলো? সমীরের কথার অবাধ্য হয়ে সে সমীরকে দুঃখ দিয়েছে—অপমান করেছে তার পবিত্র প্রেমকে—এর শাস্তিই বুঝি তাকে এবারে পেতে হবে।

মিহির এক সময়ে মিলির ঘরে ঢুকল। তার হাতে লণ্ঠন ঝুলছিল। এসো আমার সঙ্গে। মিহির তাকে ডাকল। নিরুপায় মিলি।

খাটিয়ে থেকে উঠে পড়ল সে। তার বুক কেঁপে উঠল ভয়ে। সেই সাঁওতালী যুবকটাকে দিয়ে তার ওপর অত্যাচার করানো হবে এবার বোধ হয়।

লম্বা প্যাসেজ, তারপর দালান পেরিয়ে অন্ধকার সুরঙ্গ পথ। সিঁড়ি দিয়ে নিচে নামতে লাগলো তারা। লোহার দরজা, গুহার মত একটি ঘর। চাবি দিয়ে দরজা খুলল মিহির। মিলিকে ধাক্কা দিয়ে ঘরের ভেতরে ঢুকিয়ে দিল। টাল সামলাতে না পেরে উপুর হয়ে মাটিতে লুটিয়ে পড়ল।

মিলি কাঁদতে কাঁদতে তার পা জড়িয়ে ধরল। আপনি আমার প্রভু, আমার ওপর অত্যাচার করে কি লাভ আপনার?

প্রভু। মিহির ভেংচি কাটল, তাই আমার আদেশ অমান্য করে হাত পা গুটিয়ে বসেছিলে?

ঠিক আছে, এবার থেকে আমি কাজ করব।

মিহির তাকে টেনে তুলল মাটি থেকে।

: বেঈমান, নেমকহারাম, তুমি আমার কাজ করবে? তুমি মিথ্যে বলছ, আমি তোমাকে চিনে নিয়েছি, কাজ তুমি কখনই করবে না, আমি বেশ ভাল করেই জানি। তাই তোমাকে বাঁচিয়ে রেখে কোন লাভ নেই। তবে তার আগে তোমার কাছ থেকে যতটা পারি আনন্দ পেতে চাই আমি। ঐ দড়ি ঝুলছে দেখছ? মিলি তাকাল। সিলিং থেকে দড়ি ঝুলছে। দড়ির আগায় ফাঁস তৈরী করা রয়েছে। বুকটা কেঁপে উঠল তার। হায় ঈশ্বর। চিৎকার করে উঠল মিলি।

মিহির বিদ্রূপ করে বলল, ডাক ঈশ্বরকে—দেখ সে তোমাকে বাঁচাতে পারে কিনা। তোমাদের ঈশ্বরই তো আমাকে প্রেরণা দিয়েছে তোমাদের ওপর অত্যাচার করার। যত তোমরা কষ্ট পাবে ততই বাড়বে

আমার আনন্দ। হ্যা, তোমাকে আজই মরতে হবে। কিন্তু এত সহজে নয়। তার আগে তোমার পরণের ঐ জামা আর জাঙ্গিয়াটা খুলে ফেল।

মিলি আবার তার পা ধরতে যাচ্ছিল, মিহির তার মুখে লাথি মারল। জুতুর ঘায়ে তার চিবুক কেটে গেল। রক্ত দেখে খুশিতে মিহিরের চোখ দুটো জানুয়ারের মত জ্বল জ্বল করে উঠল। জোর করে সে তার ফ্রকটা খুলে নিল গা থেকে। ছুরির ফলা দিয়ে তার দেহের শেষ সুতো জাঙ্গিয়াটা কেটে দিল। মিহিরের চোখ দুটো আর এক বার জ্বল জ্বল করে উঠল তার নগ্ন দেহ দেখে।

দেওয়ালের হুক থেকে চাবুকটা টেনে নিল মিহির এবার।

জামার নিচে এমন সুন্দর দেহটা টেরই পাওয়া যায় না। যার এমন শরীর আর এমন রূপ, সে কিনা পথে পথে ঘুরে বেড়াচ্ছিল? সতীপনার বাতিক আছে বলে মনে হচ্ছে? কি ঠিক বলেছি না।

মিলি কোন জবাব দিল না।

মিহিরের ক্ষুধার্ত চোখ দুটো যেন তার সর্বাঙ্গ চাটছে।

এই চাবুকের ঘায়ে তোমার লাগবে না, চামড়ায় দাগ পর্যন্ত পড়বে না। খালি সুড়সুড়ি দেব তোমায়। এই সুড়সুড়ির তাড়নায় তুমি নিজেই পুরুষ খুজবে, তখন তোমার দেহে অন্য জ্বালা দেখা দেবে।

মিহির তার পাছায় চাবুক মারতে লাগল। শ'দুয়েক ঘা মারার পর তখনও মিলি চুপচাপ দাঁড়িয়ে আছে। পেছনটা তার জ্বালায় অসাড় হয়ে আসছে।

মিহির বিরক্ত হয়ে চাবুকটা ছুড়ে মারল দেওয়ালের দিকে।

তবু তুমি মুখ ফুটে কথা বলবে না?

মিলি এবারও নিরুত্তর।

মিহির রাগে উত্তেজনায় তাকে এবার চিৎ করে ফেলল একটা

চৌকির ওপর। দু'হাটু দু'দিকে টেনে সে একটা অবস্থান তৈরী করে ফেলল। তার যোনী চেরা পথটা অসম্ভব বেশী ফাঁক হয়ে গেল। জরায়ু বেরিয়ে যাবার উপক্রম হল। এক সময় মিহির চাবুকটি যোনীর মধ্যে প্রবেশ করলো এবং মুচরাতে লাগলো।

মিলি কাতরে উঠল। তার চাইতে আপনি আমাকে মেরে ফেলুন। যন্ত্রণায় হৃদয় বিদারক চিৎকার করে উঠল সে।

তোর ঈশ্বরকে ডাক কুত্তি। এমন সময়ে ঈশ্বরকে ভুলে গেলি?

মিহির তাকে চুল ধরে টেনে বসাল চৌকির ওপর। তার স্তন আঁচড়ে দিল ধারাল নখ দিয়ে। নরম চামড়া ফেটে রক্ত পড়তে লাগল। তা সত্ত্বেও দু'হাতে সে তার দু'টো স্তন মুচড়ে ধরল সাংঘাতিক জোরে, যেন ছিঁড়ে ফেলবে।

ঈশ্বর!

হো হো হো করে হেসে উঠলো মিহির।

মিহিরের হাসিরের শব্দে গুহার দেওয়াল থর থর করে কেঁপে উঠল। উল্লাসে সে ফেটে পড়ল। যৌন ক্ষুদায় তখন সে উন্মত্ত। ডাক কুত্তি তোর ঈশ্বরকে আগে ডাক। বলে সে তার স্তন জোড়া আরও জোরে মোচড়াতে থাকল। সেই অবস্থায় সে নিজেকে উলংগ করে ফেলল।

মিলি তার সংগম উদ্যত অতি দীর্ঘ পুরুষাঙ্গ দেখে চমকে উঠল। নিগ্রোদের মত মোটা এবং লম্বায় প্রায় দশ বারো ইঞ্চি। উঃ সেটা নেবার কথা ভেবে আর এক দফা ভয়ে আঁতকে উঠল সে।

কি হলো? ভয় পেয়ে গেলে। মিহির খিস্তি করল—
খুব সুখ পাবে, একেবারে সুখের স্বর্গে তোমাকে পাঠিয়ে দেবে। পরখ করে দেখবে না।

না, না—এ সর্বনাশ আমার করবেন না।

মিহির তার কোন আপত্তি শুনল না। সে তার শক্ত হয়ে ওঠা পুরুষাঙ্গটা হাতের মুঠোয় শক্ত করে চেপে ধরল এবং অপর হাত দিয়ে মিলির পা দু'টো... ।

সেই মুহূর্তে যন্ত্রনা সহ্য করতে না পেরে মিলি জ্ঞান হারিয়ে ফেলল। মিহির সেই অবস্থায় তাকে ধর্ষন করল। এবং তার বীর্যপাত ঘটলো প্রায় ঘণ্টা খানেক পরে।

তারও আধঘণ্টা পরে চোখ মেলে তাকাল মিলি।

তুমি মরনি? খিস্তি করলো মিহির

ঘোলাটে চোখে তাকাল মিলি।

আস্তে আস্তে মিলির চোখের চাউনি পরিস্কার হয়ে গেল। ভয়ে ভয়ে মিহিরের জন্তুটার দিকে আড় চোখে তাকিয়ে সে বলল,---এবার আমাকে যেতে দিন, মিনতি করল সে।

যাওয়া না যাওয়া তোমার ওপর নির্ভর করছে। ঐ ফাঁসির দড়িতে তোমায় ঝুলিয়ে দেব। তোমার পায়ের নিচে থাকবে একটা টুল। আমি সেই টুলটা ধাক্কা মেরে সরিয়ে দেব। অবশ্য তোমার হাতে আমি ছুরি দেব। টুলে ধাক্কা দেওয়ার আগে তুমি যদি দড়ি কাটতে পার, বেঁচে গেলে। এবার উঠে পড়।

মিলি জানে, কোন ওজর আপত্তি টিকবে না। চৌকি থেকে উঠল সে টুলের ওপর। দাঁড়াও। মিহির তাকে হুকুম করল।

টুলের উপর উঠল মিলি।

মিহির তার গলায় দড়ির ফাঁস পরিয়ে দিল। এই নাও ছুরি। মিহির তাকে একটা ধারাল ছুরি তুলে দিল।

মিলি তার মাথার উপর সেই ছুরিটা বাগিয়ে ধরল। চোখ তার স্থির হয়ে আছে মিহিরের ওপর।

এই দাঁড়ালাম আমি, মিহির তাকে হুসিয়ারী করে দিয়ে বলল—'লাথি মেরে টুল' সরিয়ে দেব আমি। ভারী মধুর একটা শব্দ মরবার আগে শুনতে পাবে তুমি, তোমার গর্দানটা যখন মট করে উঠবে! রেডি?

মিলি প্রস্তুত হয়েই ছিল।

দু'একবার পা তুলল মিহির, কিন্তু টুলে ঠেলা দিল না। মিলিও হাত ছাড়ল না। মিহিরের চোখে শেষ মুহূর্তের উত্তেজনাটা মিলি ধরে ফেলল, যেই টুলে লাথি মারল মিহির, তার আগেই ছুরি পরলো মিহিরের দড়িতে।

টুল উল্টে গেল। মিলি ধপ করে দাঁড়িয়ে পড়ল মাটিতে। ভীষণ অবাক হয়ে গেল মিহির।

কেউ তো আগে দড়ি কাটতে পারেনি মিলি! তুমি আমাকে খুব অবাক করে দিয়েছো। নাও জামাটা পর, এ যাত্রায় তুমি বেঁচে গেলে।

এক মুহূর্তের জন্যে মিলির ইচ্ছে হল তার হাতের ধারালো ছুরিটা মিহিরের বুকে বসিয়ে দেয়। কিন্তু বলা যায় না যদি না পারে? যদি ফসকে যায়?

দু'পা এগিয়ে গিয়ে ছুরিটা সে টেবিলের ওপর রেখে দিল। তারপর ছেড়া জাঙ্গিয়ার ওপর কোন রকমে জামাটা পরে নিল মিলি।

: এসো,—

মিলি তার খুপরি ঘরে ফিরে এসে দরজাটা বন্ধ করে দিল। তারপর বিছানায় শুয়ে পড়ল উপুড় হয়ে। চোখের জলে গাল ভেসে গেল তার।

পরের দিন কাজ করতে এসে মিলি এতটুকু বিশ্রাম নিল না। সমানে কাজ করে গেল সে বেলা বারটা পর্যন্ত। বারটার পর দু'ঘণ্টা ছুটি লাঞ্চের জন্যে।

মিলি ওদের সবাইকে খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে দেখছে। প্রত্যেকেরই বয়স পঁচিশ থেকে তিরিশের মধ্যে। প্রত্যেকেই এক সময়ে খুব সুন্দরী এবং স্বাস্থ্যবতী ছিল, তাদের চেহারা দেখে অন্তত তাই মনে হয়।

সব চাইতে সুন্দরী ললিতা। বড় বড় চোখ। ঘন চুল। তাই বোধ হয় ওর শরীরে অত্যাচারের দাগটা সব চাইতে বেশী। যখনই মিহিরের মজি হবে, চারজনের একজনকে নিয়ে যাবে গুহায়, আর শুরু করবে অত্যাচার। যত রকমের বিকৃত বীভৎস অত্যাচার তার মাথায় ঢুকবে প্রত্যেকটা সে চালিয়ে যাবে নির্বিচারে।

মাঝে একদিনের জন্যে কোলকাতায় যায় মিহির এই সব জাল টাকা নিয়ে। সেখানে নানা জায়গায় এগুলি অল্প দামে বিক্রী করে বাক্স বোঝাই আসল টাকা নিয়ে আসে গাধার পিঠে চাপিয়ে। সবাই জানে ও কাপড়ের ব্যবসা করে। কাঠের বাক্স বোঝাই টেরিলিন টেরিকটের কাপড় নিয়ে আসছে।

ওকে পুলিশ ধরে না? মিলি জিজ্ঞেস করল।

কই ধরে না তো দেখছি। ধরলে ভাল হতো।

ললিতা অথবা মিলির ঘরে বসে তারা বারোটা থেকে দুটো পর্যন্ত গল্প করে। এমন করে ছ'মাস কাটল। মিলি এই অসম্ভব জীবনে প্রায় অভ্যস্ত হয়ে এসেছে।

এক সন্ধ্যা বেলায় মিহির এলো। ললিতা তার পেছনে।

এসো মিলি, মিহির বলল,—মনে হচ্ছে অনেকদিন তোমাকে আমার গোপন গুহায় নিয়ে যাইনি। তোমরা দুজনেই এসো। ভেবো না দুজনেই ফিরে আসবে। একজনকে আজ রেখে আসব। দেখা যাক কার ভাগ্য কেমন।

মিলি ভাবল, তাদের ঘনিষ্টতার জন্যেই কি এই শাস্তির ব্যবস্থা।

মিলি বেরিয়ে এলো ঘর থেকে। ললিতার দিকে তাকাল সে। বিমূর্ষ

তার মুখ, চোখের কোণায় জল ?

আবার মাটির নিচের সেই ঘর। ছাদ থেকে দড়ির ফাঁস ঝুলছে। সেই টুল সেই চৌকি দেওয়ালে ঝুলোনো যন্ত্রণা দেবার অসংখ্য সরঞ্জাম।

মিহির দরজায় তালা লাগিয়ে লণ্ঠন নামিয়ের রাখল মাটিতে। দেওয়ালে অদ্ভুত ছায়া নড়ছে মিহিরের সঙ্গে সঙ্গে। তার উন্মত্ত চোখের দিকে তাকিয়ে ওরা শিউরে উঠল।

চৌকির উপর বসে সে বলল, দু'জনেই সামনে এসে দাড়াও। যাকে দেখে বেশী খুশি হবো, তাকেই আমি আজকের একমাত্র পুরস্কারটা দেবো।

ললিতা সাহস করে বলল, যাকে দেখে বেশী খুশি হবেন, তাকে তো আপনার ছেড়ে দেওয়া উচিত নয় কি ?

মোটেই না,। বলল মিহির, যে মুহূর্তে আমি বুঝতে পারব একজনকে আমার বেশী ভাল লাগছে, তার মৃত্যু আমাকে বেশী আনন্দ দেবে।

তারপর সে মিলির দিকে ফিরে বলল—অত্যাচার করে আমি যে চরম আনন্দ পাই, আর কিছুতেই পাইনা। তাই আমি যন্ত্র নাই দেখতে চাই। আহা! কি সুন্দর তোমার চামড়া, মিলি। ভাল খাবার দেখলে যেমন জিভে জল আসে, তেমনি বাড়ছে আমার উত্তেজনা। ললিতার চামড়ার মত এখনও শক্ত হয়নি। ললিতার পাছায় তুমি আগুন ধরিয়ে দাও, দেখবে ও টের পাবেনা। কিন্তু তোমার চামড়া? আহ। মিহির যেন কোন সুস্বাদু খাবারের স্বাদ গ্রহণ করতে থাকল।

মিলি একটু আশ্বস্ত হল। হয়ত এখনও যন্ত্রণার পন্থাটা তার মাথায় ঢোকেনি। হয়ত শেষ পর্যন্ত তাকে ছেড়ে দেবে মিহির।

ললিতা তুমি জিতে গেলে। শেষ পর্যন্ত তোমাকে কি করব এখনও ঠিক করে উঠতে পারিনি।

স্যার, মিলি অনুরোধ করল, ওকে ক্ষমা করুন দয়া করে। অনেক যন্ত্রনা ও পেয়েছে।

আহা। যদি সেই রাশান সম্রাট কাই এখানে থাকত তাহলে আমাকে আর ভাবতে হত না। সে মাথা থেকে একটা। কিছু বার করে ফেলত। আমি খুব নরম লোক কিনা। এখনও হাত পাকেনি। স্কুলের ছেলে বলতে পার।

মিলি ওর মুখের দিকে তাকাল, বুঝতে পারল না ওর মতলবটা কি?

এসো মিলি, দড়ির খেলাটা তোমাকে দিয়েই প্রথমে শুরু করা যাক। উঠে পর টুলের ওপর। খেলাটা তোমার মনে আছে তো?

মিলি মাথা নেড়ে টুলের উপর উঠে দাঁড়াল। তার হাতে সেই ধারাল ছুরিটা চক্‌চক্‌ করছিল।

বেশ, এখন রেডি তাহলে।

এবার মিহির তাকে আর সুযোগ দিল না। প্রথম চোটেই টুলে লাথি মারল সে। মিলিও সমান তৎপর ছিল, দড়ি কেটে মাটিতে পড়ল। গায়ে তার একটি আঁচড়ও লাগল না।

বেশ এ যাত্রাতেও তুমি বেঁচে গেলে তাহলে। ঠিক আছে। ললিতার দিকে ফিরে সে বলল. এবার তোমার পালা ললিতা। উঠে পড় টুলের উপর। আমি আশা করি ঠিক সময়ে তুমিও দড়ি কাটতে পারবে!

ললিতা উঠল টুলে। মিহির দড়ি ঠিক করল। নতুন ফাঁস তৈরী করল। ললিতার হাতে ছুরি। ক্ষীপ্ত বেগে টুলে লাথি মারল মিহির। কোনমতে এ যাত্রাও বেঁচে গেছে ললিতা। মিহির বললো,

ঃ নাহ্‌, খেলাটা জমলো না। আমার ইচ্ছে ছিলো, যে কেউ একজন মরবে। তার মৃতলাশকে কাটবে অন্যজনায়। ঐ ছুরি দিয়েই কেটে টুকরো টুকরো করবে। মানুষের বাইরের অত্যাচারে আর আমার নেশা ধরছে না। যদি কলিজা, গুর্দা, ফুসফুসের অবস্থান চিনতে পারি তবে পরের ব্যবস্থা ওভাবেই হবে।

ললিতা ও মিলি ওর দিকে বোকার মতো তাকিয়ে রইলো। মিহির চট করে উঠে দাঁড়ালো। ওদের পাশে নিরক্ষনের চক্কর খেয়ে পেছনে এলো। ধাই ধাই করে দুজনারই পাছায় লাথি মারলো। ওরা ছিটকে উপুর হয়ে পড়লো। ললিতার সারা মুখে রক্ত। মিলির ঠোঁটটা কেটে গেছে। মজা লাগছে মিহিরের। সে আঙ্গুল দিয়ে সামনের একটা খাঁচা দেখিয়ে দিলো। খাঁচাটা সার্কাসের বাঘের খাঁচার মতোই। তবে চারভবল বড়। খাঁচার গেট খোলাই ছিলো। পূর্ব-বৎ লাথি মেরে ওদেরকে ভেতরে ঢোকালো মিহির। বাহির থেকে তালাটা লাগিয়ে দিলো। হাতে চাবী ঝুলিয়ে বললো,—

ঃ এইযে চাবী। শিকের ফাঁক দিয়ে হাত ঢুকিয়ে এই চাবী দিয়ে বেরিয়ে আসা যায় দেখতেই পারছো। চাবীটা কার ভাগ্যে আছে বলাটা কঠিন। খাঁচার পাশেই ছিলো একটা বিদ্যুৎ বোর্ড। মিহির একটু পরে কোথা থেকে একটা লিকলিকে বেত নিয়ে এলো। বেতের পেছনে সরু ইলেকট্রিক তার। সেটা লম্বায় হাত পঞ্চাশেক হবে। মিহির সুইচ বোর্ডের হাতল টেনে বেতের প্লাগটাকে বোর্ডের হোল্ডারে লাগিয়ে দিয়ে ওদের দিকে এগুলো।

এই যে দেখছো লিক লিক করছে এটা। এতে মারাত্মক পরিমানের বিদ্যুৎ আছে। মিহির খাঁচার কাছে এলো। ওরা ফ্যাল ফ্যাল করে তাকালো। আজব খেলার নেশায় চোখ দুটো চক্‌চক্‌ করছে মিহি-রের। বললো,

ঃ আমার ঠাকুর দাদা জঙ্গলে থাকতো। হাতি ধরতো--বাঘকে বশে আনতো। এটা সেই বাঘেরই খাচা। এই কাজটা আমার ঠাকুর্দার নেশার কাজ ছিলো। আমার নেশা চেপেছে তোমাদের নিয়ে নতুন খেলা করার। কোমর থেকে দুটো ধারালো চাকু শিকের মধ্যে দিয়ে ওদের দিকে ছুড়ে দিলো মিহির।

: নাও এ দুটো। আমি এক থেকে একহাজার গুনবো। এর মধ্যে যেকোন একজন বাঁচবে আর অন্যজন মরবে। শর্তটা হচ্ছে—তোমরা যে যাকে পারো খতম করবে। যে খতম করতে পারবে—এই চাবী তার হাতে যাবে। আর যদি একহাজার গুনবার পরও দুজন বেঁচে থাকো তবে এই চাবুকে দুজনকেই নরকে পাঠাবো। এবার চিন্তা করে দ্যাখো—কে বাঁচতে চাও আর কে মরতে চাও।

ওদের চোখমুখ ফ্যাকাশে হয়ে উঠলো। মিহির বললো,

: এই মজার খেলাটার জন্যেই তোমাদের আনা হয়েছে। তবে আমার ঠাকুর্দা যেহেতু জানোয়ার নিয়ে খেলতো তাই জানোয়ারের রূপটা আমি তোমাদের মাঝে দেখতে চাই। দুটো পুরষ না হয়ে দুটো মেয়ে নিয়ে খেলাটা কি উত্তম আর উপভোগ হবে, সে আমি ভাবতেই পারছি না। ওয়ান-টু-থ্রি বললেই তোমরা লেগে যাবে। হ্যা, এবার জানোয়ার হও—অর্থাৎ পোষাক সমস্তই খুলে ফেলো। দুশ্চিন্তার ঘোরে ওরা ঘামছিল। সেটা দেখে মিহির বললো,

আহ্, কি মজাদার উপভোগ্য এই খেলা। ললিতা ও মিলি দাড়িয়ে ছিলো নিচের শিকের ওপরের লোহার পাটাতনের মেঝের ওপরে। পোষাক খুলতে ওরা একটু দেরী করতেই বিদ্যুৎ বেগে ইলেকট্রিক বেতটা খাঁচার বাইরে শিকে আঘাত করলো। মুহূর্তে মিলি ও ললিতা পায়ের তলে বিদ্যুতের শর্ট খেয়ে ছিটকে পড়লো দুদিকে। হেসে উঠলো মিহির। ওরা চটপট কাপড় খুলে ফেললো।

মিহির বললো,

: একটু দেরী করো তোমরা। পুরো খেলাটা জমতে হবে। সে একটা বড় শুড়কি নিয়ে এলো। যার মাথাটায় ছিলো ইস্পাতে ধারালো ফলা। ফলার মাথায় নক্ষত্রের ঝিকিমিকি। মিহির বললো,

দু'জনাই যদি বেঁচে যায় আর আমি যদি চাবুক দিয়ে তাদের শেষ করি তবে ভেবে দেখলাম, খেলাটা ঠিকমতো জমে উঠবে না। তারচেয়ে শতোগুন মজাদায়ক হচ্ছে—খুঁচিয়ে খুচিয়ে হত্যা করা। রেডি-ওয়ান—টু—থ্রি।

প্রথমে ললিতা ও মিলি দুজন দুদিকে সরে গেলো। কারো হাতের চাকুরই কোনো নিশানা নেই। মিহির তেতে উঠে খাঁচায় বিদ্যুত লাগালো। ওরা দু'জনই শট খেয়ে ছিটকে পড়লো। চাকুটা কুড়িয়ে নিয়ে মিলির দিকে তাক করলো ললিতা। তার চোখে অশ্রু। মিলির চোখ আগেই ভেজা চিলে'। সে বলে উঠলো,

: দিদি আমার বুকটাকে এফোড় ওফোড় করে শান্তি দে! ললিতার পেছনে সামান্যক্ষণ বিদ্যুৎ বেতের ছোয়া লাগলো। চাকু হাতে ললিতা এবার হিংস্রভাবে এগিয়ে এলো। মিহির প্রায় একশনের কাছাকাছি চলে গেছে। ললিতার চাকুর সামনে বুক চেতিয়ে নিজের চাকু ফেলে দিলো মিলি,

: বেচে যা আমাকে শেষ কর।

ললিতা নিজেকে শক্ত করে তুললো! দু'হাতে মিলির বুকের মাঝ বরাবর নিশানা করে চাকু তুললো। সর্বশক্তি দিয়ে গাথতে গিয়েও পারলো না। হাত কেঁপে চাকু পড়ে গেলো। ললিতা দু'হাতে সাপটে ধরলো মিলিকে। উভয়ে উভয়কে জড়িয়ে ধরে কাঁদছে। মিলি বলে

: দিদি এইতো ছিলো দুজনার কাঙ্ক্ষিত মুক্তি। কেন, কেন তা করলি না তুই।

: আমি পারবো না মিলি। তোকে আমি বড় ভালোবাসিরে। তুইও আমার মতো জনম দুখিনী। শপাংকরে চাবুক পড়লো খাচায়। আবার দুজনা ছিটকে পড়লো দুদিকে। ললিতা এবারে চাকু না তুলে,

মিহিরের দিকে এগুলো। দু'হাতে বর্শা তুলে সে গুনছে—

ঃ দুশো তিন—দুশো চার—দুশো পাঁচ—

ললিতা খাচার মধ্যে হাটু ভেঙ্গে বসে পড়লো। কান্না ভরা আর্তনাদ,

ঃ না না—আমি পারবো না—কিছুতেই না। এই নিষ্ঠুর খেলার আগে তুমি আমাকে শেষ করে দাও। এক মিনিটকাল চোখ মুদে মিহির কি ভাবলো। তারপর হাতের বর্শার সরু ঝক্‌ঝকে ফলাটা ললিতার বুক বরাবর এফোড় ওফোড় করে দিলো। আর্তনাদ। ফিনকি দিয়ে রক্ত বেরুলো। দুহাতে চোখ ঢাকলো মিলি। মিহির ললিতার পিঠ দিয়ে বর্শার ফলাটা একহাত বার করে দু'চারটে ঝাকি দিতেই শিথিল হলো ললিতার অঙ্গ প্রত্যঙ্গ।

ঃ দিদি—দিদি—। বুকে জড়িয়ে ধরে কেদে উঠে মিলি! চিৎকার করতে থাকে,

ঃ দাও—দাও আমাকেও ললিতার মতো শেষ করে দাও। ইস—কি শান্তি কি আনন্দ ওর। ঐ দ্যাখো ললিতার চোখের কোল বেয়ে শান্তির অশ্রু নামছে। দাও মিহির আমাকেও শেষ করে অমন শান্তি দাও। বন্য জন্তুর উল্লাসে কুৎসিৎভাবে হেসে উঠে মিহির

ঃ এতো শান্তি কি করে পাবে তুমি। তোমার কলিজাটা ছোট। ওরটা বড়। তাই ও আগে মরতে চেয়েছে। এখোন তুমি ঐ চাকু দিয়ে ওর বুকটা কেটে কলিজাটা বের করো। দেখবে কতো বড়—

ঃ না—না, এই মহাশান্তি আমাকে আপনি দেবেন না।

ঃ ঠিক আছে। শান্তি না দিয়ে শান্তিই দিচ্ছি।

মিহির হাতের বর্শার ফালে মিলির ডান বাহুটা বিদ্ধ করে তাকে খাচার ভেতরে এক কোণে চেপে ধরলো—

ঃ আ—আ—আ—প্রচণ্ড যন্ত্রনায় মিলি সজা হারাতে বসলো। মিহির বললো,

: এবারে তলপেটের নীচের অঙ্গ দিয়ে এই ফলাটা ডোকানো হবে—এটা কলিজাতে গিয়ে ঘা মারবে,

না—না। ভয়ার্ত হয়ে ওঠে মিলি।

যা বলছি—ঝট্‌পট্‌ করো তবে!

মিলি বুঝলো, মৃত্যু যন্ত্রণা কতো কঠিন। বহুবার মৃত্যুকে আলিঙ্গন করেও মৃত্যু যন্ত্রনার ভয়ে সে বাঁচতে চেয়েছে। এবারেও সে তাই করলো ললিতা তো মরেই গেছে। ওর আর দুঃখ ব্যথা কি? এটা চিন্তা করে মনস্থির করলো মিলি। চাকুটা কাঁপতে কাঁপতে তুলে নিলো?

০ ০ ০ ০ ০

রাতে এক সঙ্গে খেতে বসেছে। মিলি ও মিহির। মিহির বললো, : ললিতা তোমাকে বেশ খাতির করেছে। মিলির চোখ দুটো ছল ছল করে ওঠে। তুমিও কি ওর মতো ললিতাকে খাতির করো?

মিলি বুঝলো, এতে বিপদ বাড়তে পারে। তাই সে ভয়ে ভয়ে বললো : না।

তাহলে ওটা খেতে আপত্তি করছো কেনো? নাও।

মাংসভর্তি একটা বাটি এগিয়ে দেয় মিহির। বলে,

দেবরাজ নামে একটা লোকের সঙ্গে পার্টনারশীপে আমি নাঙ্গা পর্বতে একটা টুরিষ্ট হোটেল খুলেছিলাম। তখোন থেকেই আমার নেশাটা জাগিয়ে দেয় দেবরাজ। আমরা দু'জনা মিলে কুকুরকে বধ করে, খাসীর সাংসের নামে চালাতাম। দেবরাজের নিজেরও এটা খুব পছন্দ ছিলো। আমাকে বলতো খেয়ে দ্যাখো মিহির-ভেরী টেষ্টি! সেই প্রথম কুকুরের মাংস। —ব্যাস নেশা ধরে গেলো। বিচিত্র স্বাদের নেশা, প্রথমে কুকুর। পরে বানর—হনুমান—নেকড়ে এবং বাঘ! একদিন খুব ইচ্ছে হলো—মানুষের মাংস খাবো। যে সময়ে নেশাটা চাগাড় দিলো সে সময়ে আমাদের টুরিষ্ট হোটেলে কোনো টুরিষ্ট ছিলো না।

শীতের সময়। দারুণ শীত—বরফে জমে বাবুর্চিটা মরে গেছে দুদিন আগে। অন্যান্যরা পালিয়েছে। কি করি? নেশাতো আর আমাকে মানবে না। অগত্যা দেবরাজকেই ঘুমন্ত অবস্থায় শেষ করলাম। দেবরাজের কথাটা মিথ্যে নয়-মানুষের মাংসের স্বাদ বেশী। তবে একটু বেশী লবণ না দিলে, আদি স্বাদটা বেরোয় না।

মিলি হা করে মিহিরের কথা শুনছে। বল্লমের মাথায় পিঠকে রক্তাক্ত করে মিলিকে নিয়ে মিহির ললিতার কলিজা বের করিয়েছে। কাটিয়ে, তেল জল দিয়ে রাঁধিয়েছে। এখোন আবার খেতে বলছে। মিলি মানুষের কলিজা খাবে? তাও ললিতার?

: না। মৃত্যুপণ তবু সে এটা করতে পারবে না! মিহির তেড়ে উঠে

: কি হলো? খেয়ে স্বাদ নিচ্ছোনা কেন?

: আমি পারবো না।

ভেবে দ্যাখো?

ভাবাভাবি শেষ। আপনি যা খুশি করতে পারেন।

ঠিক আছে। কালকেই তোমার কলিজাটা এভাবে বাটিতে উঠে আসতো। কিন্তু তাতে তো তোমার মুক্তি! আমি তোমাকে শাস্তি দেবার জন্য আরো দু'মাস পরে কলিজাটা খাবো। প্রতিদিন প্রতিটি নিঃশ্বাসে যেনো কথাটা মনে পড়ে তোমার! যেখানে তোমার জীবন, সেই হৃৎপিণ্ডটাও এই টেবিলে উঠে আসবে।

: যা ইচ্ছে আপনার। আমি আর ভাবি না কিছুই! কেমন দৃঢ়তা ব্যাঞ্জক, কঠিন সুর শোনা গেলো মিলির কণ্ঠে! মিহির তার দিকে ফটমট করে তাকালো, ঠিক যেনো হায়েনার দুটো চোখে ভাটার আগুন। জ্বল জ্বল করে উঠেছে। নতুন কি একটা পরিকল্পনায় মিহিরের চোখের আগুন একটু স্তিমিত হয়ে এলো। বললো,

ঠিক আছে। বাটি টেনে ললিতার কলিজা গপাগপ গিলছে মিহির

পেটের নাড়িভুড়ি উল্টে আসছিলো মিলির। বহুকষ্টে দাঁতে দাঁত চেপে সে বমিটাকে দমন করতে সক্ষম হলো।

মিহিরের নাকি এত বেশী টাকা জমে গেছে দু'হাতে খরচ করেও ফুরাতে পারছে না। তাই সে মনে মনে ঠিক করেছে এই ব্যবসা বন্ধ করে দেবে, সারা জীবনের সঙ্গতি যখন তার এরই মধ্যে হয়ে গেছে।

মাস খানেক পরে মিহির আবার এলো মিলির কাছে।

চল মিলি, তোমার সঙ্গে আমার কথা আছে। ভয় পাবার কিছু নেই। এব্যাপার সম্পূর্ণ আমারি! এক অদ্ভুত আনন্দ আমি পেতে চাই। কিন্তু তোমার চিন্তার কোন কারন নেই, এসো।

ওরা আবার সেই গুহা ঘরে নেমে এলো।

শোন মিলি, তোমাকে যে কথা বলতে আমি এখানে নিয়ে এসেছি শোনো সেই কথাটা। মিহির বলতে থাকে।

: আমার আর টাকার প্রয়োজন নেই। সারা ভারতে আমার মতো ধনী আর একটিও পাবে না তুমী। কিন্তু ওদিকে আমার ধরা পরবার সম্ভাবনা দেখা দিয়েছে। হয়তো শেষ পর্যন্ত এত টাকা, আমি আমার এই গোপন আড্ডাখানা থেকে নিয়ে যেতে পারব না। কারণ, মনে হচ্ছে পুলিশ আমার এই ঘাঁটি জানতে পেরেছে। যদি তাই আমার অদৃষ্টে ঘটে তাহলে ঐ দড়ি হবে আমার শেষ দড়ি। ঐ দড়িতেই ওরা আমাকে ঝোলাবে, যেমন অনেক মেয়েকে ঝুলিয়ে আমি আনন্দ পেয়েছি। আমার যন্ত্রণায় আমি কম আনন্দ পাব না।

মিলি অবাক হয়ে গেল। লোকটা কি পাগল হয়ে গেল নাকি!

: এর প্রথম স্পর্শের আনন্দটা আমি উপভোগ করতে চাই মিলি। গলায় ফাঁসের টানে বাস্তবিক কতটা আনন্দ আছে সেটা আমি উপলব্ধি করতে চাই। একান্তই যদি আনন্দ না ও পাই, এটা তো ঠিক যে, ফাঁসির সময়ে

ভয় অনেক কমে যাবে, তাই বলে মনে করো না, মৃত্যুকে আমি ভয় পাই। স্বর্গ নরক দুইই আমার কাছে সমান। কিন্তু মৃত্যু যন্ত্রনা আমি ভোগ করতে চাই না। একেবারেই নয়। সুতরাং মিলি, আমি তোমায় যা করছি, তুমি আমার উপরে ঠিক তাই করবে। আমি খানিকটা আনন্দ পাব। তার পর তুমি যখোন সুবিধে বুঝবে, টুলটা সরিয়ে দেবে পা দিয়ে!

মিহির উঠে পড়লো টুলের ওপর। গলায় ফাঁস লাগিয়ে গেরোটা টান করে দিল।

মিলি হাঁ করে তাকিয়ে আছে। মিহির যে তার সঙ্গে ঠাট্টা করছে না, এ সম্বন্ধে নিশ্চিত।

যখন বুঝতে পারবে আমার নিঃশ্বাসে কষ্ট হচ্ছে, মৃত্যুর যন্ত্রনা ফুটে উঠেছে চোখে মুখে, তখন টুলটা টেনে দেবে পায়ের নিচে। কিন্তু তার আগে নয়। এই আনন্দ থেকে আমাকে তুমি বঞ্চিত করো না যেন। মিলি, ভুলো না আমি আমার প্রাণ তুলে দিচ্ছি তোমার হাতে। এর পরে আমি তোমাকে মুক্তী দেব, আমার সব ঐশ্বর্য তুলে দেব তোমার হাতে—যাতে জীবনে তুমি আর কষ্ট না পাও। মনে থাকবে?

মিলি মাথা নাড়লো। তার মনে থাকবে।

মিলি টুল সরিয়ে নিল।

মিহির ফাঁসির দড়িতে ঝুলতে থাকলো। গলা আর কপালের শিরা গুলি তার আস্তে আস্তে মোটা হয়ে উঠলো। চোখ দুটো যেন কোটর থেকে বেরিয়ে আসছে। জিব ঝুলে পড়লো মুখের বাইরে। কোন রকম সামান্য একটু ইশারা করতে পারল সে।

মিলি সঙ্গে সঙ্গে টুল লাগিয়ে দিল তার পায়ের নিচে। ফাঁস কেটে নেমে পড়লো মিহির—বসলো টুলের উপর।

একটু প্রকৃতিস্থ হয়ে সে বললো ওহ ? মিলি ? কেউ কল্পনা করতে পারবে না, কি অদ্ভুত আনন্দ যে আমি পেয়েছি। কি আশ্চার্য অনুভূতি। এ পর্যন্ত যত জ্ঞান আমি অর্জন করেছি। এ জ্ঞানই হল শ্রেষ্ঠ। এবারে যদি ওরা, আমাকে ফাঁসি দিতে চায় দিক। ফাসির অভিজ্ঞতা আমার হয়ে গেছে। কিন্তু এই ভীষন আনন্দ আমাকে আর এক আনন্দে উদ্বোদ্ধ করছে। কি করব বল ? এই রকমে তো মানুষের স্বভাব আর বদলায় না। এইমাত্র তুমি আমায় জীবন দিয়েছ। আমাকে রক্ষ করেছ মৃত্যুর হাত থেকে। চরম আনন্দ লাভের জন্যে তাই আর একটি মৃত্যু আমি দেখতেই চাই।

ঃ এ আপনি কি বলছেন ? মিলি চেচিয়ে উঠল।

ঃ ললিতার কি হয়েছে দেখেছ তো ? তোমারও ঠিক তাই হবে। জীবন বাচালে জীবন তো দিতেই হবে। একই করণে তোমার ও ঠিক তাই হবে। ওর সঙ্গেই মিলন হবে তোমার। ওর বিক্ষত লাশটা যে গর্তে ফেলা হয়েছে, তোমাকে ও সেখানে ফেলবো আমি, তবে জ্যান্ত। একবার ভাবতে পার কি মজাটাই না হবে। এমন আমোদ ক'টা লোকের ভাগ্যে জোটে বল।

মিহির টুল থেকে উঠে তার হাত ধরে ফেলল।

মিলি চেঁচিয়ে উঠল। আপনি নিজেই বলেছেন, আমি আপনার প্রাণ দিয়েছি। তার বদলে আপনি আমায় হত্যা করে আনন্দ পেতে চান ?

মিহির তার কথায় কর্ণপাত করল না। তাকে টেনে নিয়ে গেল গুহার এক প্রান্তে। গর্তের ঢাকনাটা খুলে ফেলল। একটা ভয়ঙ্কর দুর্গন্ধ ছড়িয়ে পড়ল ঘরের বাতাসে। নিশ্বাস টানতে কষ্ট হয়। কিন্তু মিহির নির্বিকায়। দড়িতে লণ্ঠন ঝুলিয়ে দিল সে গর্তের ভেতরে, যাতে আলোয় মিলি পরিষ্কার দেখতে পায় ভেতরটা। তারপর ওর দুই হাতের নিচ

দিয়ে দড়ি ঢুকিয়ে পিঠে গেরো বাঁধল মিহির, পরক্ষণেই মিলিকে ঠেলে দিল গর্তের মধ্যে।

মিহির দড়ি ধরছে শক্ত করে। আস্তে আস্তে দড়ি ছাড়ছে সে। মিলি ওদিকে ঝুলতে ঝুলতে নিচে নামছে। পচা মাংসের উৎকট গন্ধে নিঃশ্বাস তার বন্ধ হয়ে আসছে। প্রায় তিরিশ ফুট নিচে নামিয়ে তাকে ঝুলিয়ে রাখল মিহির।

দড়ির বাঁধনটা অত্যন্ত শক্ত হয়ে আটকেছে পিঠে—বুক যেন চিরে যাচ্ছে। মিহির আরো খানিকটা ঝুলিয়ে দিল তাকে।

মিলি চোখ নামিয়ে দেখতে পেল গলিত শব! হয়তো ললিতার হবে। চারিদিকে নরকংকাল। এত লোককে হত্যা করেছে মিহির। তারও কি এই অবস্থা হবে? আর কোনো দিন কি সে দিনের আলো দেখতে পাবে না? হায় ঈশ্বর। তুমি রক্ষা করো।

মিহির তাকে টেনে তুলল উপরে।

তুমি ভয় পেয়েছিলে মিলি?

ওহ! ভগবান

: ঠিক এমন করেই তুমি একদিন মরবে। আমি চেয়েছিলাম মৃত্যু সম্বন্ধে তোমার অভিজ্ঞতা হোক।

মিহির তার শেষ জাল নোট বিক্রী করতে যাচ্ছে কোলকাতায়।

মিলি তার পায়ের উপর ঝাঁপিয়ে পড়ল। আমাকেআপনি ছেড়ে দিয়ে যান। যদি দয়া হয় সামান্য কিছু টাকা দিতে পারেন। আমি কোলকাতায় ফিরে যাব।

আমি তোমাকে ছেড়ে দিই, আর তুমি বাইরে গিয়ে সব বলে দাও আর কি। না না তা হয়না মিলি।

: আমি প্রতিজ্ঞা করছি, মুখ খুলবো না কারো কাছে। আপনি আমার

উপর দয়া করুন।

ঃ না। দয়া এবং কৃতজ্ঞতা এ দুটো জিনিস তুমি পাবে না আমার কাছ থেকে। এর চাইতে তিনগুন বড়লোক যদি হতাম তাহলে ও কোনো দরিদ্রকে আমি একটি পয়সাও দিতাম না। কারুর কষ্ট দেখলেই আমি আনন্দ পাই। তাকে আরো কষ্টে ফেলতে ইচ্ছে করে। দরিদ্রকে সাহায্য করা মানে প্রকৃতির বিরুদ্ধতা করা। প্রকৃতিই তো তাকে দরিদ্র করে কষ্ট দিচ্ছে।

ঃ আপনি যদি ধনী না হতেন—বলতেন এ কথা?

ঃ আলবৎ বলতাম। কেননা, সেটাই হতো আমার ভাগ্য। পশ্চিম বঙ্গে লক্ষ লক্ষ ভিখারী আছে। ফাঁসির কাঠে ঝুলিয়ে দিক সবাইকে। ভিখারী আর থাকবেনা আর তারাও আজীবন কষ্ট থেকে মুক্তি পাবে। পশ্চিম বঙ্গ বাঁচবে ভিখারীর হাত থেকে।

ঃ মনুষ্যত্ব সহৃদয়তা, পবিত্র কাজ, এসবের কি কোনোই দাম নেই?

এগুলি সুখ এবং শান্তির অন্তরায়। মানুষের নির্বোধ সংস্কার থেকে মুক্ত বলেই আজ আমি সুখী। মানুষকে ঠকিয়ে আজ আমি এত বড় হতে পেরেছি। তুমি ও তাই পারতে। অনেকেই তা পারে। কিন্তু তোমরা মিথ্যে সততার ল্যাজ ধরে ঝুলে রইলে। যাচ্ছ অধঃপাতে।

মিহির তার কোনো অনুরোধই রাখলো না। পরদিন সে চলে গেল।

একরাতে মিলির হঠৎ ঘুম ভেঙ্গে গেল। চারিদিকে লোকের ভীর আর চিৎকার। সে বেড়িয়ে এলো ঘর থেকে। দেখলো অন্য মেয়েরাও তার মতন বেড়িয়ে এসেছে বাইরে। মিহিরের গোপন আড্ডাখানার লোকেরা সবাই ছুটোছুটি করছে। সবারই হাতে বন্দুক।

পুলিশ বাড়ীর চারদিক ঘিরে ফেলেছে। দরজা ভেঙ্গে ভেতরে ঢুকছে তারা। স্থানীয় থানার ও, সি চিৎকার করে বললো—বাঁধা দিয়ে কোনো

লাভ হবে না। যদি প্রাণে বাচতে চাও, ধরা দাও। নইলে সবাইকে বন্দুকের গুলীতে উড়িয়ে দেয়া হবে।

ওরা বুঝতে পারল এত পুলিশের বিরুদ্ধে লড়াই করে কোনো লাভ নেই। সবাই বন্দুক ফেলে দিয়ে ধরা দিল।

বন্ধ দরজা লাথি মেরে বাইরে থেকে যে সব পুলিশ ঢুকেছিলো, তাদের সামনে ছিলো যে সুদর্শন রাজপুত্র তুল্য পুরুষ, তাকে প্রথম দেখায় চিনতে পারা কঠিন হলেও মিলি চিনলো—এই সেই কানু নাম ধারী সমীর সেন! এমোন ফিট্, ফাট্, ও স্মার্ট ভঙ্গিতে তাকে কখনোই এর আগে দ্যাখেনি মিলি। যে কোনো মেয়ের স্বপ্নের রাজপুত্তুরের মতো সবার সামনে একটা পিস্তল হাতে দাড়িয়ে ছিলো সে! বেশ হাসি হাসি মুখখানি অথচ বেশ একটা গাম্ভীর্যের ছাপ রয়েছে। পিস্তলের নলটা আড্ডার প্রতিটি লোকের দিকে এমোন অবস্থায় তাক করা রয়েছে, যে কেউ নড়লেই বিপদে পড়বে—এরা আগেই অস্ত্র ফেলে দিয়েছিলো। গর্জে ওঠে কানু,

ঃ হ্যাণ্ডস আপ - অল জেন্টেলম্যান এ্যাণ্ড দ্যা ভেরী সুইট বিলভড লেডি মিলি সেন!

মিলিও সবার সঙ্গে হাত তুললো। কানুর চোখের ইঙ্গিতে ও. সি, তার দলবল নীয়ে ওদের প্রত্যেকের কোমরে দড়ি ও হাতে হ্যাণ্ডকাপ পরালো। কানু মিলির দিকে তাকিয়ে ও, সি, কে বললো,

ঃ ওকে হাতকড়া লাগিয়ে কাজ নেই—শতো হলেও মেয়েমানুষ!

ও. সি, ভয়ে ভয়ে বলে,

ঃ কিন্তু স্যার মেয়ে হলেও সে জাতসাপের বাচ্চা। কালপ্রিটকে কিশ্বাসকি?

এমোন অসহায় অস্থায়ও মিলি ফোস করে ওঠে,

ঃ খবরদার—আমার বাপকে নিয়ে কথা বলবেন না—

ও, সি, বলে,

দেখলেন তো স্যার, আদি কালকেউটের বাচ্চা এটা —পিঠমোড়া করে বেঁধে চ্যাং দোলা করে অথবা চুল ধরে হেঁচড়াতে হেঁচড়াতে নিতে চাই একে। হুকুম দিন—

মিলি অকুতভয়েই বললো,

ঃ দোষ আমার থাকলেও আমার বাপ মায়ের নেই—অনর্থক বকাবাজি করবেন না বলে দিচ্ছি—

ও, সি, ফুঁস করে ওঠে,

ঃ তবেরে বেজাতের বাচ্চা—দিচ্ছি তোকে শিক্ষা-সেপাই একে বুকে লাথি মারতে মারতে পুলিশ ভ্যানে তোলো। একটা সেপাই মিলির দিকে এগুতেই হাত তুলে তাকে ক্ষান্ত করে কানু। বলে,

ঃ মাই ডিয়ার ব্যাটেলিয়ান, ফলো মাই অর্ডার?

ও, সি সদলবলে পা ঠুকে এ্যাটেইনশন হয়ে দাঁড়ায়। কানু বলতে থাকে,

মিলি সেনকে বাদে সবাইকে নিয়ে তোমরা ভ্যানে থানায় গিয়ে আইন মাফিক চালান দাও!

ও, সি, কট্‌মট্‌ করে মিলিকে দ্যাখে? বলে,

আর একে আমি নিয়ে যাবো স্যার?

না। আমার কাষ্টডিতে যাবে সে-

ও, কে, স্যার!

সবাই বুট মেরে অর্ডার অনুযায়ী কাজ করে। অল্পক্ষণেই কানু ও মিলি বাদে ঘর খালি হয়। কানু বলে,

ঃ আমি বড্ডো দুঃখিত মিস্‌ মিলি। বিবেকের কাঠগড়ায় তুমি যাই হও-তবু আইনের কাঠগড়ায় তোমাকে সবচে মারাত্মক একটি গ্যাং-এর সদস্যা ও আসামী হয়ে দাঁড়াতে হবে? একদিন যে মিলি আমার কথা স্বেচ্ছায় রাখেনি—সে আজ বাধ্য আমার সঙ্গে যাবার জন্য। চলো-

মিলি কোনো কথা না বাড়িয়ে কানুর সঙ্গে ঘর ছেড়ে বাইরের জিপে গিয়ে উঠে। ড্রাইভার পুলিশটা গাড়ী ছেড়ে দেয়। ওরা দু'জন পেছনে বসেছিলো। কানু পেছনে হেলান দিয়ে কথা বলতে থাকে।

: যা কখনো চাইনি, তাই আমাকে করতে হলো মিস্ মিলি। সে-দিনের প্রত্যাখানের পর স্রষ্টার কাছে বলেছিলাম, যেনো তোমার সঙ্গে আমার কখনো দেখা না হয়—তবু অদৃষ্টের ফের—তাই হলো, যা আমি চাইনি।

মিলি কোনো কথা বলে না—কঠিন দেখায় তার চেহারা। চলন্ত গাড়ীর হাওয়ায় ওর তেলহীন রুক্ষ চুলগুলো একটু একটু করে উড়ছে। কানু ফের বলতে থাকে,

: আমার সান্তনা অন্ততঃ এটুকুই, আমি যাকে একদিন প্রাণ দিয়ে ভালোবাসতাম—আমি তার ক্ষতির চিন্তা করিনি! আজো যা আমার হৃদয়পটে নির্মল এক পূর্নিমা শশী হয়ে আছে—আমি তার ভাগ্য নিয়ে ছিনিমিনি খেলিনি—বরং এজন্য কিছুটা দায়ী সে নিজে?

মিলির কাছ থেকে প্রত্যুত্তর না পেয়ে, তবু একাকী বলে যায় কানু

: জানিনা যাকে আমি চিরদিনই ভালোবেসে যাবো—সে আমাকে কোনোদিনও বুঝতে পারবে কিনা! তবে ইশ্বরের কাছে হৃদয়ের যদি কোনো মূল্য থেকে থাকে—তবে আমি কায়মনোবাক্যে প্রার্থনা করি, ঈশ্বর আমার নিষ্পাপ প্রাণের আকুতি রাখবেন এবং যথা শীঘ্রই তাকে বিপদমুক্ত করবেন।

অনেকক্ষণ মৌন স্তব্ধতার পর, সহসা দু'হাতে মুখ ঢেকে ফুপিয়ে কেঁদে ওঠে মিলি! অঝোর বর্ষণের মতো কাঁদতেই থাকে মিলি! কাঁদতে কাঁদতে হেচ্‌কী উঠছে—তবু কান্না তার থামেনা। কানুকে দারুণ গম্ভীর দেখালো। সে একটিবারও মিলির কাঁধে বা মাথায় সান্তনাবাক্য উচ্চারণ করলো না! শুধু জীপখানি থানা দুয়ের মাঝে এগুবার পথে গম্ভীর ও ভাঙ্গা ভাঙ্গা কণ্ঠে বললো,

: আজ থেকে আর কারো সুখ দুঃখের ভার নেবার স্বপ্নটা আমার থাকলো না—সব ভেঙ্গে গেলো! যে পাখীকে ভুল করে খাচায় রাখতে চেয়েছিলাম—সে নিজেই যে পিঞ্জরে থাকতে চাইলো না। তার সুখ দুঃখের সান্তনা দেবার সর্বশেষ অধিকারটুকুও সে চিরতরে সেদিন ছিনিয়ে নিলো কোলিয়ারিয়াতে! যে দুঃখ মোচনের অধিকার টুকুও আমার নেই—সে দুঃখ শুধু দুঃখ নয়—এক অসীম অসহ্য যন্ত্রণা। এক সীমাহীন হাহাকার—আমৃত্যু যা আমাকে সইতে হবে।

o o o o

সম্পূর্ণ আইনানুগ কাজ করলো সমীর। মিলির ওপর টর্চার—যেনো না করা হয়—তেমোন মৌখিক নির্দেশ দিয়ে গেলো। ঠাণ্ডা মেজাজী একজন পুলিশ ইনসপেক্টরকে মিলির ইনকোয়ারী অফিসার হিসেবে নিযুক্ত করা হলো।

সমীরের কাজ থানা লেভেলের অনেক উপরে। তবু সে মাঝে মধ্যেই টেলিফোনে ওর সেই থানার অফিসারের কাছ থেকে সমস্ত খবর নিতো মিলির। দিনে দিনে দিন চলে গেলো—অনেক অফিসিয়াল প্রসিডিওর শেষ হবার পর, একদিন মিলিকে আদালতে মিহিরের দলের সঙ্গে কাঠগড়ায় আসামী হয়ে উঠতে হলো।

কিছুই করার নেই। মিলি এবারে নিজেকে সম্পূর্ণভাবে ভাগ্যের ওপর সপে দিলো! এই প্রথম তার অন্তরতলে কে যেনো অস্ফুট স্বরে বলে উঠলো,

ঈশ্বর বলে কেউ একজন আছেন—যাকে তুমি দেখতে পাওনা বটে কিন্তু তিনি তোমার সবকিছুই দ্যাখেন ও বুঝেন—তুমি তার কাছে আত্মসমর্পন করো—মিছেমিছি আত্মপ্রবঞ্চনা করো না।

মামলা কোর্টে উঠতেই প্রাথমিক শুনানীতে মিলি সম্পূর্ণভাবে নিজের

দোষ স্বীকার করলো। বৃদ্ধ প্রবীন জজের সামনে সেদিন সে তার জীবনের সমস্ত কাহিনী বয়ান করলো। ইতিবৃত্ত বলতে বলতে মাঝে মাঝেই সে ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কেঁদে উঠছিলো। বৃদ্ধ জজ সবই বুঝলেন মেয়েটি দুর্ভাগ্যের হাতে বন্দিনী—অনিচ্ছায় দুর্বৃত্তের ফাঁদে পড়ে আজ আসামীর কাঠগড়ায় এসে দাঁড়িয়েছে।

বিচারের সময় আদালতে মিলি মিহিরের সমস্ত কীর্তি খুলে বলল। কিছু বাদ দিল না। জামা খুলে দেখাল সারা শরীরের অসংখ্য অত্যাচারের চিহ্ন! ম্যাজিস্ট্রেট নিজে তার জন্য ওকালতি করলেন।

মিলি ছাড়া পেয়ে গেল। আদালতের লোকেরা কিছু চাঁদা সংগ্রহ করে তার হাতে দিল।

আনন্দে মিলির চোখ দিয়ে জলের ধারা বইতে লাগল। তাহলে এতদিন পরে তার দুঃখের অবসান হল।

আদালত থেকে বেরিয়ে সে হাঁটতে লাগল রাস্তায়, নির্বান্ধব। একাকিনী!

সন্ধ্যার আগেই সে একটা হোটেলে আশ্রয় নিল।

তিন দিনের দিন সে যখন ডাইনিং রুমে খেতে বসছে, লক্ষ্য করল একটি স্থূলাকায় মহিলা তার দিকে বার বার—তাকাচ্ছিল। পোশাকটি তার বেশ জমকালো। মুখটা তার খুব চেনা চেনা, কোথায় দেখেছে খেয়াল করতে পারল না সে।

মহিলাটিও তাকে দেখছিল। খাওয়ার শেষে সে মিলির পাশে এসে বসল। বলল, তুমি মিলি নও? যাকে আমি দশ বছর আগে জেল থেকে উদ্ধার করেছিলাম। মিসেস সুতপা ঘোষালকে তুমি চিনতে পারছ না?

মিলির এবার তাকে চিনতে অসুবিধে হল না। হ্যাঁ, আমি মিলিই বটে।

আমি তোমার মামলার কাহিনী শুনেছি। দেখ মিলি, ভালমানুষ

হলে এমন বিপাকেই পড়তে হয়। তোমার ও সব ভালমানুষি ছাড়। সুতপা তার হাতের কয়েকটা হীরের আংটি গলায় এবং হাতে দামী জড়োয়ার গহনা দেখিয়ে বলল, তোমার মত ভালমানুষ হলে আজ আমি না খেতে পেয়ে মড়ে যেতাম।

ঃ কিন্তু অসৎ উপায়ের উপার্জনে আপনি কি চিরকাল সুখী থাকতে পারবেন?

আজকের দিনে না পারাটা অসম্ভব কিসের? তবে প্রত্যেকটা লোক যেখানে সৎ সেখানে তুমি সততা নিয়ে সুখী হতে পার। কিন্তু যেখানে বেশীর ভাগ লোক অসৎ, দুর্নীতিগ্রস্ত সেখানে তোমার সততার কোনো মূল্য নেই। যাই হোক আমি তোমাকে সাহায্য করতে পারি। তুমিও আমাকে ছোট্ট একটা কাজ করে দেবে। এই নাও এক হাজার টাকা এ্যাডভান্স।

মিলি হাত গুটিয়ে নিল। জানতে চাইল, কাজটা আপনার কি আগে বলুন।

খানিক আগে আমাদের টেবিলের যে যুবকটি বসে খাচ্ছিল, দেখছ নিশ্চয়ই!

ঃ হ্যাঁ।

ঃ হ্যাণ্ডসাম দেখতে। ওর সঙ্গে আলাপ আছে। ও বলেছে তোমাকে নাকি ও ভালবেসে ফেলেছে। তোমার মত সুন্দরী মেয়ে নাকি হয় না। নাম ওর ব্রতীন সেন। বিরাট ব্যবসায়ী। ওর প্রায় দশ লক্ষ টাকা আছে! ওর সঙ্গে আলাপ করে, ভালবাসার অভিনয় করে ওর ঐ টাকাটা হাতিয়ে নিয়ে আসতে পারলে তুমি আমি এ দেশ ছেড়ে বাইরে অন্য কোথাও চলে যাব। সেখানে তুমি আমি নিরাপদে সুখে থাকতে পারব। কেমন রাজী আছ তো?

মিলি একটু সময় কি যেন ভেবে বলল হ্যাঁ। কিন্তু তার আসল উদ্দেশ্য হল ব্রতীনকে সতর্ক করে দেওয়া।

বেশ। এই তো ভাল মেয়ের মত কথা বলেছ। তোমার বুদ্ধি এত-দিনে খুলেছে দেখছি। ঠিক আছে এই কাজের জন্যে তোমাকে পাঁচ হাজার টাকা দেব, কেমন?

o o o

মিলি আলাপ করে বুঝল, ব্রতীন সত্যিই তাকে ভীষন ভালবাসে। সে ওর সঙ্গে অনেক বেড়াল। তারপর একদিন তার সঙ্গে দূরে পিকনিক করতে যাওয়ার আগে বলল ব্রতীন তুমি মন দিয়ে আমার কথাটা শোনো। তোমার কোনো বন্ধু এখানে কাছাকাছি কোথাও আছে!

: হ্যাঁ, বিমল বলে একটি ছেলে ষ্টেশনের কাছে থাকে! তাকে পাওয়া যেতে পারে। কিন্তু কেন বল তো?

: পিকনিকে যাওয়ার আগে তোমার ঘরে তাকে বসিয়ে যেতে হবে।

: কিন্তু এ কথা তুমি কেন বলছ?

: প্রয়োজন আছে। মিসেস ঘোষাল একজন সাংঘাতিক ডাকাত। তোমার অনুপস্থিতিতে সে তোমার সব টাকা চুরি করে নেবে।

: কিন্তু চাবি তো আমার কাছে থাকছে?

: ওর মতো একজন ডাকাতের কাছে সিন্ধুকটা ভাঙ্গা অসম্ভব ব্যাপার নয়।

ব্রতীন পিকনিক থেকে অসুস্থ হয়ে হোটেলে ফিরল। স্থানীয় ডাক্তার তাকে পরীক্ষা করে দেখে বলল ওকে বিষ খাওয়ান হয়েছে। একটু পরেই সে মৃত্যুর কোলে ঢলে পড়ল।

ওদিকে মিসেস সুতপা ঘোষাল উধাও।

ব্রতীনের বন্ধু বিমল মিলিকে বলল আপনি আর এর মধ্যে নিজেকে জড়াবেন না। এখুনি পুলিশ আসবে। তার আগেই আপনি এই হোটেল থেকে পালান। আমি এক ভদ্রমহিলার ঠিকানা দিচ্ছি, আজ রাতটা সেখানে থাকুন, কাল সকালে আপনার পরবর্তী ব্যবস্থা আমি করব। আর এদিকটা আমি সামলাবার ব্যবস্থা করছি। যান, এখুনি এখান থেকে চলে যান।

তখনো বিকেলের আলো রয়েছে আকাশে। আবার তাকে রাস্তায় নামতে হল। রতীনের মৃত্যু তাকে গভীর আঘাত দিয়েছে। সে জানে এর জন্যে মিসেস ঘোষালই দায়ী।

সে ভেবেছিল রতীনের মত এক জন সৎ যুবকের সঙ্গে বিয়ে হলে তার সমস্ত কষ্টের অবসান হবে। চলতে চলতে সে তার উদ্দেশ্যের কথা ভুলে গেল। দশ বছর পরে তার ছোট বোন লিলির কথা মনে পড়ল। আহা, তার সঙ্গে যদি এখন একবার দেখা হয়ে যেত।

একটা ক্ষুদ্রশ্বাস বেরিয়ে এলো মিলির বুক থেকে। কে জানে, এই সুদীর্ঘ দশটি বছরে তার সহোদর বোনটির কি দশা হয়েছে! ... মনে পড়ে, সেই রাতটির কথা। এক সঙ্গে দু'বোন ওরা শীলা মাসীর দুয়ারে সামান্য কয়েকটি টাকার জন্য: ধন্না দিয়েছিল। যে শীলা মাসী তার দুর্দশার দিনে মিলির মায়ের কাছে হাত পাততো — অবস্থার পরিবর্তনে, সে তাদেরকে তার প্রাসাদোপম অট্টালিকার দুয়ার থেকে দারোয়ান দিয়ে কুকুরের মতো তাড়িয়ে দিয়েছিলো; হাতে সৌভাগ্যের স্বর্ণচাবী পেয়ে শীলা মাসী তাদেরকে চিনতেও পারেনি।

এরপর একদম নিরাশ্রিত পথের মানুষের জীবন। জনৈক গাড়ী-অলা তাদেরকে নিয়ে গিয়েছিলো নিজের বাড়ীতে। এক রাতের আশ্রয়দানের নামে মিঃ রায় নামের সেই লোকটি তার ড্রয়িংরুমে মিলির জীবনের পবিত্রতার প্রথম কুসুমটিকে ছিন্ন-বিচ্ছিন্ন করতে চেয়েছিলো। আপ্রাণ চেষ্টায় তার দানবীয় হাতের থাবা থেকে সেবার নিজেকে রক্ষা করতে সক্ষম হয়েছিলো মিলি। কিন্তু তার সহদোর বোন লিলির সঙ্গে সেই রাতেই ছিলো তার শেষ দেখা। সেই দু'বোনের প্রথম বিচ্ছিন্নতা। মিঃ রায়ের ড্রয়িংরুম থেকে মিনিট খানেক বাদে বাইরে বেরিয়েই মিলি চির জনমের মত তার বোনটি লিলিকে হারিয়ে-

ছিল। কে জানে, লিলি কি তার কোমল প্রস্ফুটিত যৌবনের পরম পবিত্রতাকে ঐ অবস্থায় সমাজের হায়েনাদের শ্যান দৃষ্টি থেকে বাঁচাতে পেরেছিলো কিনা? কে জানে, লিলি আজো বেঁচে আছে কিনা? ওরকম সহজ সরল কচি মেয়েটি কি ট্রাম বাসের নিচেই কাটা পড়ে মরলো কিনা তাই-ই বা কে জানে? আসল ঘটনাটা কি ছিল-এবার সেটা জানা দরকার।

পাঁচ

দশ বছর আগের সেই ঘটনা। রাত দশটা বেজেছে একটু আগেই। মিলি সেই লোকটার সঙ্গে তার বাসায় ঢুকে গেছে। আর ঠিক তখন একজন লোক প্রচণ্ড ধাক্কা মেরে লিলিকে ফেলে দিয়ে বা দিক থেকে ডান দিকে চলে গেল। ব্যাপারটা ভালো করে বুঝে উঠবার আগেই একটা পুলিশ জীপ ধুলো উড়িয়ে ওখানে ছুটে এলো। সশব্দে ব্রেক কষে দাড়ালো। মুহূর্তেই চারজন অস্ত্রধারী পুলিশ লাফিয়ে নামলো সে জীপ থেকে। তারা প্রথমে লিলিকে একজন বললো.

ঃ এইযে মেয়ে, এদিকে একটা বদমাশকে পালাতে দেখেছো?

লিলি তার দেহ থেকে ধুলো ঝাড়তে ঝাড়তে উঠে দাড়ালো। বললো,

হ্যা—

ঃ কোনদিকে গেছে?

ঃ ওই তো-ঐদিকে, ডান হাতে।

পুলিশরা হুইসিল বাজিয়ে ওদিকে ছুটলো। জীপটাও তাদেরকে অনুসরণ করলো। এখানে দাড়িয়ে থাকাটা সমিচীন মনে করলো না লিলি। সে অন্ধকারের দিকে এগিয়ে গেলো। একটা কালো ইম্পালা গাড়ী এলো একটু পরেই। সেটাও লিলির কাছে এসে দাড়ালো, পৌঢ় এক ভদ্রলোক গাড়ীর জানালা থেকে মুখ বাড়ালেন। লিলিকে প্রশ্ন করলেন,

ঃ এই যে, তুমি এখানে কতক্ষন?

লিলি নির্বাক রইলো। ভদ্রলোক পুর্ণঃ প্রশ্ন করেন,

ঃ এখান দিয়ে একজন লোক দৌড়ে গেছে—তা তুমি দেখেছো?

লিলি তবু নির্বাক রইলো।

ভদ্রলোক এবারে বললেন,

ঃ তুমি কি বোবা না কালা হে?

লিলি জবাব দিল,

ঃ আমি বোবাও নই—কালাও নই।

ভদ্রলোক সামান্য হাসলেন। বললেন,

তবে তুমি কি?

ঃ আমি একজন সুস্থ সবলা দুঃখী মানুষ। ক্ষুধার জ্বালায় এখন কাতর হয়ে পড়েছি। ভদ্রলোক বললেন,

ঃ তা রাস্তায় রাস্তায় এমন সবল দেহ নিয়ে ভিক্ষে চাইলে কে-ইবা তোমাকে খেতে দেবে বলো?

লিলি ক্ষুব্ধভাবে জবাব দিলো,

ঃ আমি ভিখেরী নই।

ঃ তাহলে?

বললামই তো ভদ্র ঘরের ভদ্র মেয়ে, ভাগ্যদোষে পথে নেমে ছি।

ভদ্রলোক যেন লিলির কথায় কি একটা মজা খুঁজে পেলেন। একটা সিগ্রেট জ্বেলে তিনি বললেন,

কিভাবে তুমি ভদ্র ঘরের ভদ্র মেয়ে হয়ে পথে নামলে, তা আমাকে একটু বোঝাতে পারো কি?

নেহায়েত বিরক্তির সঙ্গে লিলি বলে,

আপনি কি চিৎপুর রোডে কখনো গিয়েছেন?

ঃ হ্যা, তা প্রায়ই যাই—গতকালও গিয়েছি। কেন?

ঃ সেখানে শরৎ সেন নামে কাউকে চিনতেন?

ঃ শরৎ সেন—শরৎ সেন—ভদ্রলোক মাথায় আঙুলের টোকা মেরে কি যেন স্মরণে আনবার চেষ্টা করছিলেন। পরে বললেন,

আচ্ছা, এই নামে কেউ কি কখনো আত্মহত্যা করেছিল?

ঃ আজ্ঞে। উনিই আমার বাবা।

ঃ কাগজে খবরটা পড়েছিলাম বটে, 'ঋণের দায়ে আত্মহত্যা, শিরো নামের এই খবরটা বেশ চাঞ্চল্যের সৃষ্টি করেছিলো, তা কিভাবে কি হলো তোমাদের—

ঃ সে অনেক কথা, বলতে সময় লাগবে!

ঃ আচ্ছা, ঠিক আছে তুমি আপাততঃ কোথাও যেওনা, আমি তোমার ঘটনা শুনতে চাই।

কথাটা বলেই ভদ্রলোক ড্রাইভারকে ইঙ্গিৎ দিলেন গাড়ী সামনে চালাতে। ব্যাপারটা যেখাপ্পা ধরনের মনে হলেও অনাহারে ক্লান্ত লিলির পক্ষে আর কোঁথাও যাওয়া সম্ভব ছিলো না। সে ওখানেই একটা ল্যাম্প পোষ্টের ধারে শিরিশ গাছের নীচের অন্ধকারে চুপচাপ বসে রইলো।

একটু পরে সত্যি সত্যিই ভদ্রলোক ফিরে এলেন। গাড়ী থামিয়ে বললেন,

ঃ ও, আছো তাহলে দেখছি—নাও ওঠো।

ঃ কোথায়?

ঃ কোথায় যেতে চাও?

লিলি নির্বাক। উদাস তার দুটি আখি তারা। তার এই অসহায় রুচি চেহারাটা ভদ্রলোকের হৃদয়ে মায়াময় ছাপ ফেললো। বললেন তিনি,

ঃ এখন তো কোথাও ঠাঁই নেই তোমার—তাইনা?

ঃ আজ্ঞে।

কি চাও তুমি আমার কাছে?

ঃ কারো কাছেই কিছু চাইবার নেই আমার!

ভদ্রলোক সামান্য হেসে গাড়ী থেকে নামলেন। কোটের পকেটে দু'হাত রেখে বললেন,

ঃ যাবে মোথায়?

জানিনা।

ঃ খাবে কি?

ঃ জানিনা।

থাকবে কোথায়?

জানিনা।

ঃ পড়বে কি? একাপড়টাও তো ছিড়ে ছিড়ে কুটি কুটি হয়েছে—

ঃ জানিনা!

তোমার কি কিছুই চাইবার নেই আমার কাছে?

লিলি রুষ্টভাবে তাকিয়ে বললো,

আগেই তো বলেছি—আমি ভিখেরিনী নই যে কারো দুয়ারে করুনার পাত্রী হবো। চাওয়ার কিছু থাকলে তা ভগবানের কাছেই চাই

ঃ কি সেটা?

ঃ যা সাধারন মানুষের মৌলিক চাহিদা—সেই অন্ন বস্ত্র ও আশ্রয়।

ঃ আমি যদি সেটা দেই?

কেন দেবেন? কিসের বিনিময়ে?

ঃ যেভাবে ইচ্ছে তোমার? দয়ার দান কিংবা শ্রমের বিনিময়ে! আচ্ছা. তুমি কি রাঁধতে পারো?

ঃ মধ্যবিত্ত বাঙ্গালীর ঘরে জন্ম নিলে ওটা সব মেয়েদেরই জানা থাকে—

ঃ তাহলে চলো আমার সঙ্গে—

ঃ কোথায় ?

আমার বাড়ী।

লিলি চিন্তিত হলো। ভদ্রলোক গাড়ীর দরজা খুলে বললেন,

ঃ নাও ওঠো, দেরী হয়ে যাচ্ছে। তুমি শ্রমের বিনিময়েই তোমার চাহিদা পূরণ করতে চাও বুঝেছি আমি। আর সে সুযোগটাই আমি তোমাকে দিতে চাই। আমার ওখানে তুমি অন্তত, খেয়ে পড়ে বেঁচে থাকার সুযোগ পাবে। নাও, ওঠো—

লিলি অনেকক্ষণ কি দেখলো সেই ভদ্রলোকের মাঝে। তার পর নিঃশব্দে তার গাড়ীর খোলা দরজা দিয়ে পেছনের সিটে উঠে বসলো। ভদ্রলোক উঠলেন সামনের সীটে গাড়ী চলতে লাগলো। ভদ্রলোক আরেকটা সিগ্রেট জ্বাললেন। ধোয়া ছাড়তে ছাড়তে বললেন,

ঃ কি নাম তোমার ?

লিলি।

ক' ভাই ক' বোন তোমার ?

ঃ ভাই নেই—মাত্র দু'বোন। মিলি নামের আমার বড় বোনকে একটু আগেই আমি হারিয়ে ফেলেছি—

কোথায় হারালে ? কি ভাবে হারালে ?

এর উত্তরটা সত্য ভাবে দেবার নয় তাই লিলি আপাতত: চুপ রইলো। এ গলি, ওগলি ঘুরে, গাড়ী প্রশস্ত রাজপথে উঠে এলো। সারি সারি আলোক সজ্জিত পথ বনাঢ্য বিপনি দু'ধারে। তার মধ্য দিয়ে দামী ইম্পালা গাড়িটা মরাল রাজ হংসীর মতো হেলে দুলে

চলেছে। লিলি ক্ষানিকটা স্বাভাবিক হয়ে এসেছে। ভদ্রলোক বললেন,

জানো লিলি, এ সমাজে এখনো উপযুক্ত লোকের জন্য সামান্য কর্মস্থান আছে। সারাদেশের লোক বলছে, আমরা বেকার। কথাটা মিথ্যে নয়—তবে এটাও সত্যি যে—কাজের উপযুক্ত লোকেরও বেশ অভাব রয়েছে।... যাকগে, লেখাপড়া কদ্দুর করেছো?

: খুব সামান্য।

ঃ ভেরী স্যাড। তোমাদের জন্য এটা দুর্ভাগ্য বটে। হ্যাঁ তার পর বলতো দেখি তোমাদের ঘটনাটা।

লিলি ভদ্রলোককে অতি সংক্ষেপে তাদের ভাগ্য বিপর্যয়ের কাহিনী বললো। ভদ্রলোক বড্ড শান্ত এবং ধীরস্থির ভাবে সে কাহিনী শুনলেন। এই লোকটির চেহারার মাঝে লিলি তার বাবার কি একটা ছাট যেন দেখতে পেলো। আর দশটা মানুষ থেকে তাঁর কোমল হৃদয়টাও যেন একটু ব্যতিক্রম—সহানুভূতিতে ভরা। কেমন একটা দয়ার্দ্র ভাবের সঙ্গে বিষন্ন ব্যথায় গাম্ভীর্য মিশে আছে তার পূর্ণ অবয়বে।

লিলি সহসা তাঁকে প্রশ্ন করে বসে.

আচ্ছা ঐ পুলিশের ব্যাপারটা কি আপনার?

ঃ কোন পুলিশ?

: একটু আগে আপনি যাকে খুজছিলেন—তেমন একটা লোককে পুলিশ তাড়া করছিল?

ঃ তাই নাকি? হ্যাঁ, আমারই ঘটনা এটা।

কি ঘটনা, জানতে পারি?

ঃ শুনবে? শোনো তবে—আমার বাড়ীতে একটা রাধুনে ব্রাহ্মন ছিলো। লোকটাকে খুব বিশ্বাস করতাম আমি। গত বছর থেকে সে আছে আমার ওখানে। কোনোদিনও কোনো অসুবিধা করেনি। ইদানিং

সে হাজার পাঁচেক টাকার একসেট গহনা নিয়ে ভেগেছে। গত পরশু আমি এ ব্যাপারে থানায় জি, ডি, করেছি। পুলিশ তার সন্ধান পেয়ে আমাকে ফোন করেছিলো। আমরা তাকে ধরবো বলে থানা থেকে বেরিয়েছিলাম। একটা শুড়িখানা থেকে সে পালাতে পালাতে এদিকে এলো। কিন্তু সেই জায়গাটা, যেখানে তোমাকে পেলাম সেখান থেকে তাকে হারালাম।

ঃ ও!

গাড়ী ডানদিকে মোড় নিলো। লিলি একটুবাদে বলে,

এখন সেই পাচক ব্রাহ্মনের কাজেই আমাকে খাটাবেন বুঝি?

হ্যাঁ।

কিন্তু আমরা তো জাতে সত্যিকারের ব্রাহ্মন নই, আপনার অসুবিধা হবে না?

ভদ্রলোক সামান্য হেসে বললেন,

ঃ আমার নাম বারীন বোস। নামটা শুনেই বুঝতে পেরেছো আমার পরিবার জাত ও শ্রেনী। কিন্তু আজকাল কোনো ব্রাহ্মনের প্রতি অন্ধ শ্রদ্ধা যেমন নেই তেমনি কোন নমস্যদ্র বা চাড়ালের প্রতি আমার কোনো ঘৃনা বা উদাসিকতা নেই। আমি শুধু এটুকুই বুঝি-মানুষ মানুষই-ডোম চামার মেথর মুচি-ধোপা নাপিত বল, আর ব্রাহ্মণ রায় বাহাদুর বল, আমার চোখে সবাই সমান। এব্যাপারে বলতে পারো আমি মুসলমানদের মহান আদর্শকে মনে প্রাণে গ্রহন করেছি।

লিলি কি ভাবতে থাকে। গাড়িটা এক সরু গলিতে ঢুকছে। লিলি বলে,

পাচক বামুনটা যে নেকলেস চুরি করেছে—সেটা বুঝি আপনার

ভদ্রলোক মুচকীহাসলেন, কোন জবাব দিলেন না। লিলি অনেক খোলা মেলা হয়ে এসেছে। শত হলেও ভদ্র ঘরের মেয়ে, সে অবস্থার ফেরে চাকরানী হ:ত চলেছে তাই বলে সম্পর্কটাকে সে একেবারে মনিব চাকরানীর পর্য্যায় নামিয়ে আনেনি। তাই সে বলে,

আমার কথার জবাবে হাসলেন যে একটু খানি।

মিঃ বারিন বোস বললেন,

আমার বাড়ীতে গেলেই তোমার জবাবটা পাবে।

ছয়

অল্পক্ষণেই ওরা বারীন বোসের বাড়ীতে এলো। বিশাল দ্বীতল অট্টালিকা। প্যাটার্ন অনেকটা সেকেলে। সামনেই বাগান, কারু কার্য খচিত থাম, বিশাল লৌহ ফটক, সারা বাড়ীতে দামী কার্পেট ও মূল্যবান আসবাব। গেটের দারোয়ান সন্ত সিং ও মালি কাঙ্গালীর সঙ্গেই কেবল লিলির পরিচয় হয়েছে।

এ ঘর ও ঘর করে সারা বাড়ীর প্রতিটি রুম ঘুরতে লিলির আধঘনটা কেটে গেলো। পরে সে এসে বারীন বোসের ড্রয়িং রুমে ঢুকলো। বারীন বাবু রাতের পোষাক পড়ে একটা পাইপ মুখে টেলিফোনে কথাবার্তা বলছিলেন। সংলাপ শুনে মনে হলো তিনি থানার কারো সঙ্গে কথা বলছেন।

টেলিফোন রেখে তিনি পার্শে দণ্ডায়মান লিলির দিকে তাকালেন। লিলির বিস্মিত চোখ মুখ দেখে তিনি প্রশ্ন করলেন,

কি হয়েছে লিসি! খাওনি কিছু?

হ্যাঁ খেয়েছি। কাঙ্গালী কাকা আর আমি এক সঙ্গেই খেয়ে নিয়েছি।

যাও তবে তুমি শুয়ে পড়ো। নীচে তোমার শোবার খরটা তো তোমাকে দেখিয়েই দিয়েছি।

আজ্ঞে।

লিলি নিশ্চুপ মাথা হেটকরে দাড়িয়ে রইলো। বোস বাবু বললেন,

কি? জামা কাপড়ের কথা ভাবছো? আমি কাল সকালেই সেগুলোর ব্যবস্থা করবো। ক্লান্ত শরীরে আর রাত জেগোনা—যাও।

লিলি তবু নড়ছে না দেখে, বোস বাবু তাকে প্রশ্ন করেন,

আর কিছু বলবে?

আজ্ঞে!

বোস বাবু তার রিভলভিং চেয়ারটা একটু ঘুরিয়ে সোজাসুজি তাকালেন লিলির দিকে,

কি বলবে বলো?

এ বাড়ীতে আর কেউ নেই?

বোস বাবু যেন জানতেন, এই প্রশ্নটিই করবে লিলি-অচিরিতে উঠে দাড়ালেন তিনি। গাউনের পকেটে হাত ঢুকিয়ে পাইপ টানতে টানতে ব্যালকনিতে গিয়ে দাড়ালেন। সামনে নিচ্ছিদ্র অন্ধকার। মাথার ওপর ঝুলন্ত ফুলের টব। গেটের মাধবী ভিলা ও বাগানের হাস্নাহেনার ঝোঁপ থেকে মৃদু সুবাস ভেসে আসছে।

বোস বাবু রেলিং-এ কনুই রেখে ঝুঁকে পড়ে কি যেন ভাবলেন কিছুক্ষন। তারপর সোজা হয়ে ঘুরে দাড়ালেন। সামনেই লিলিকে দাড়িয়ে থাকতে দেখে তিনি চমকে ওঠেন.

এখনো ঘুমোতে যাওনি?

আপনি ঘুমুবেন না?

বড় দুঃসাহসে ভর করে কথা কয়টা বললো লিলি। বারীন বাবু এবার গম্ভীর থম থমে চেহারায় যেভাবে লিলির দিকে তাকালেন. তাতে লিলি বেশ ক্ষানিকটা ভড়কে গেলো। বারীন বাবুর কঠিন দৃষ্টির সামনে দাড়িয়ে থাকতে কেমন যেন অস্বস্তি বোধ করছিলো। সে এভাবে স্বল্প পরিচয়ের একজন বয়স্ক ব্যক্তির ব্যক্তিগত ব্যাপার

স্যাপারে তার নাক গলানোটা সম্ভবতঃ ঠিক হয়নি—বিশেষ করে তাদের সত্যিকারের সম্পর্কটা যেখানে মনিব ও ভৃত্যের।

লিলি ইতস্ততঃ করে বললো,

আমি যাই তবে?

দ্রুত পা চালিয়ে দিয়েছিলো সে সিড়ি ঘরের উদ্দেশ্যে। কিন্তু রাশভারী মানুষটার জলদ গম্ভীর কণ্ঠস্বর শুনে তাকে থমকে দাঁড়াতে হলো।

শোনো!

লিলি ধীর পদক্ষেপে বোস বাবুর দিকে এগিয়ে এলো। আনত দৃষ্টি তার। বোস বাবু বললেন,

ঃ তুমি ক্ষানিকটা শিক্ষিতা এবং ভদ্র ঘরের মেয়ে তাই সহজেই বুঝবে যে, মানুষের ব্যক্তিগত ব্যাপারে নাক গলানোটা কতবড় অন্যায়—

আজ্ঞে!

কথাটা বলেই আরেকদিকে ঘুরে গেলেন তিনি। লিলির দিকে পিঠ ফিরিয়েই বলে গেলেন,

হ্যা, কেউ হয়তো তাও পারে, তবে সে জন্য তার তেমন অধিকার থাকা চাই। আর সে অধিকারটা তৈরীকরে নিতে হয়।

বোস বাবুর কথা ঠিক মতো বুঝতে না পারলেও আন্দাজ করতে পারলো সে। কিন্তু এক্ষেত্রে কেবল সাবধান হয়ে যাওয়া ছাড়া আর কিছুই করার নেই। লিলি তাই বললো,

ঃ কথাটা আমার মনে থাকবে বাবু—এবারে আমি যাই-

আর এক দণ্ডও দেরী না করে বিদায় নিলো সে সেখান থেকে।

এ বাড়ীর চাকরানী হয়ে দিন বেশ ভালই কাটছিল লিলির। সবচেয়ে কষ্টকর ব্যাপারটা হচ্ছে সময় কাটানো। বিশাল বাড়ী: কিন্তু বাড়ীর ভেতর একটিও মানুষ নেই। সাত সকালে উঠেই বাবু বাড়ীর বাইরে বেরিয়ে যান, ঘরে ফেরেন রাত ৯'টা দশটায়। মাঝে মধ্যে কখনো লাঞ্চ আওয়ারে বাসায় ফেরেন—তা মিনিট দশেকের বেশী অবস্থান করেন না। আসেন খান এবং চলে যান।

হিন্দীভাষী সন্ত সিংয়ের সবকথা ঠিকমতো বুঝতে পারেনা লিলি। কাঙ্গালীর কথা বুঝে তাই কাঙ্গালীর মুখ থেকে সে যতোটা যা জানতে পেরেছে তাতে বাবুর নাকি একজন পুত্র সন্তান ছিলো। আজ থেকে পাঁচ বছর আগে তার সঙ্গে কি কথা কাটাকাটি হয়—তাতে সেই সন্তান পিতার এই বাড়ী থেকে সেই—যে বেরিয়ে গেছে আর কোনদিন ফিরে আসেনি।

সন্তানের দুঃখে তার—অর্থ্যাৎ বাবুর স্ত্রী দু'বছর পর শয্যাশায়ী হন এবং অকালে মৃত্যু বরণ করেন। এই লোকটার মাঝে যে এমন সব দুঃখ আছে—তা যেন ভাবতেও পারেনা লিলি। কেমন যেন মায়া হয় তার বাবুর জন্য, কিন্তু কিছুই বুঝি করার নেই।

বাবুর অনেক টাকা। দু'দুটো কটন মিল আছে তার। ম্যানেজার জেনারেল ম্যানেজাররা তা দেখা শোনা করেন। এই মিল দুটোই নাকি আগে দেখা শুনা করতেন বারীন বাবু। আর যে কোলিয়ারটা এখন তিনি দেখাশুনা করেন—সেটাই দেখতো তার সেই

নিরুদ্দেশ ছেলে সুশোভন বোস। ছেলেটা যে কোথায় গেছে তা তা কেউ বলতে পারেনা।

বারীন বাবু আগে মাঝে মধ্যে বাইরে থেকে মদ খেয়ে চোখ দুটো লাল টক টকে করে ঘরে ফিরতেন কিন্তু সেদিন তিনি সন্ধ্যের পরেই নিজের ঘরে মদের বোতল নিয়ে বসলেন। লিলিকে মাঝে মধ্যে সোডা বোটল এটা সেটা এগিয়ে দিতে হচ্ছিলো। সাহেবের চোখ দুটো কেমন লাল টক টকে রক্তজবার মতো হয়ে উঠেছে।

সাহেবকে অনেক কিছু বলতে ইচ্ছে হচ্ছিলো। বহু কষ্টে নিজেকে সংযত রাখলো লিলি। পরদিন সকালেই একটা অভাবিত কাণ্ড ঘটলো। সকালে ঘর থেকে নিয়ম মাফিক বাইরে চলে গেছেন সাহেব। দুপুর এগারোটায় কোলিয়ারি থেকে টেলিফোন ধরেই বাবুর উদ্বিগ্ন কণ্ঠটা শুনতে পেলো,

কে লিলি?

আজ্ঞে বাবু!

সর্বনাশ হয়েছে লিলি?

আমার এখানকার সমস্ত কিছুর চাবীর গোছাটা খুজে পাচ্ছি না। ওটা তো এখানেই রয়েছে - ফেলে গেছেন আপনি!

তাই নাকি?

আজ্ঞে। আমি আপনার ফোন নাম্বার জানিনা, নইলে আপনি চলে গেলেই ওটা পাবার পর ফোন করতে চেয়েছিলাম।

ওহ্-বাঁচালে তুমি! আসছি আমি এক্ষুনি!

বাবু বাড়ীতে ফীরে এলেন আধঘন্টা পরেই। চাবীর তোড়া হাতে পেয়েই প্রথমে তিনি ষ্টিল আলমারীটা খুললেন-নাহ সবই ঠিক আছে। আগামী কাল মিলের ও কোলিয়ারির লোকদের বেতনের

তারিখ। দেড় কোটি টাকা তুলে রেখেছিলেন তিনি ব্যাংক থেকে। উপরের একটা তাকে বোঝাই বাণ্ডিলের পর বাণ্ডিল টাকা রয়েছে। ড্রয়ারে চাবী চালালেন—সেখানেও রূপা হিরা পান্নার জড়োয়া গহনা ঠীকমতো আছে। খুশীর আতিশায্যে তিনি লিলিকে জড়িয়ে ধরলেন,

সাব্বাশ মা—সাব্বাশ! আমাকে খুশী করেছিস তুই—আমিও তোকে খুশী করবো: তবে তা এখন নয়। আমি ফিরে আসবার পর।

দ্রুত এসেছিলেন তিনি: দ্রুতই বিদায় নিয়ে চলে গেলেন। গাড়ীতে বসে পিঠ ঠেকিয়ে দিলেন গদীতে। স্বস্তির নিঃশ্বাস ছেড়ে একটা সিগ্রেট জ্বালালেন। ভাবলেন সেই পাচক বামুনটার কথা। মাত্র পাঁচ হাজার টাকার একটা সোনার হারের লোভ সে সামলাতে পারলোনা—আর লিলি? সবকিছু হাতে পেয়েও বেঈমানী করেনি। মেয়েটির সততায় সত্যি এবারে মুগ্ধ হলেন তিনি।

রাতের বেলা তিনি ড্রাইভারের হাতে একগাদা প্যাকেট সহ ঘরে ঢুকলেন। একান্তই নিভৃতে লিলিকে ডেকে নিয়ে বললেন:

: এখানে একটা সাউথ কাতান একটা কটন বেনারশী শাড়ী আর দুটো বাঞ্জিভরম শাড়ী আছে—যেটা খুশী বেছে নাও। ইচ্ছে করলে সব ক'টাও রাখতে পারো, আপত্তি নেই।

লিলি চুপচাপ দাড়িয়ে রইলো। বোস বাবু বললেন,

কি পছন্দ হয়নি একটাও? লিলি নিরুত্তর। বোস বাবু বললেন,

: তুমি খুশী হওনি? কিন্তু আমি তো তোমাকে খুশী করতে চেয়েছিলাম লিলি। বলো কি চাও তুমি কি পেলে খুশী হবে—বলো?

লিলি একটু চুপ থেকে বলে

ঃ যা চাই—তা কি দিতে পারবেন আপনি ?

ঃ কি বলছো তুমি লিলি ! আমি বারীণ বোস—বোস টেক্সটাইল মিল, মায়া কটন মিল, সবচে বড় কোলিয়ারিটা আমারই। আমি তোমাকে দিতে পারবো না, এমন কি আছে ?

ঃ আমি চাই-

ঃ কি চাও তুমি বলো ?

ঃ অধিকার !

। কিসের অধিকার ?

ঃ আমি-আমি আপনাকে বাবা বলে ডাকতে চাই।

লিলি-

হ্যা বাবা, আপনাকে দেখে কেবলই আমার বাবার কথাই মনে পড়ে।

ওদের কথা শেষ হবার আগেই দারোয়ান জানালো পুলিশ অফিসার ডি, কে, ঘোষ দেখা করতে চান।

পাঠিয়ে দে !

ও.সি, ঘোষ ঢুকলো। হাতে তার একটা প্যাকেট।

নমস্তে, স্যার !

নমস্তে। কি ব্যাপার ঘোষ বাবু !

আপনার হারানো হারটা পেয়েছি।

কই, কোথায় দেখি

এই নিন ?

পুটুলিটা বারীন বাবুর দিকে এগিয়ে দেয় ও,সি, বাবু। পুটুলী খুলে দেখে ভয়ানক খুশী হন তিনি।

থ্যাংক ইয়্য ঘোষ বাবু-থ্যাংক ইয়্য! আপনার কাজে আমি খুশী হয়েছি। জিনিসটা সামান্য একটা সোনার হার কিন্তু এটা বড্ড স্মৃতিময়। মায়া সব সময় এটা কণ্ঠে দিয়ে চলাফেরা করতো।

স্যার—

ও, সি, র দিকে ফিরে তাকালেন বোস্ বাবু। বললেন,

কি বলবেন জানি আমি ও, সি, বাবু! কালকেই আপনার ছেলেকে দরখাস্ত দিয়ে পাঠিয়ে দেবেনা কোলিয়ারীতেই চাকরী দেবো আমি ওর

ধন্যবাদ স্যার, ধন্যবাদ?

ও, সি, বিদায় নিলো। বোস বাবু সেই হার হাতে লিলির দিকে এগিয়ে এলেন। বললেন,

ঃ মা বুড়ো বাবার পক্ষ থেকে এই ক্ষুদ্র উপহারটাই তুমি গ্রহন করো। এ হার দামে ক্ষুদ্র হলেও আসলে ক্ষুদ্র নয়, অনেক অনেক বড়।

নিজ হাতে লিলিকে হার পরিয়ে দিলেন তিনি। লিলি বাবা 'বাবা, বলে বোস বাবুকে জড়িয়ে ধরলো ও প্রনাম করলো। আর ঠিক তার আধঘন্টা পরেই বিদেশের একটা ট্রাঙ্কল এলো। ট্রাঙ্কল রিসিভ করেই তিনি বাচ্চা শিশুদের মতো চেচাতে লাগলেন,

ঃ লিলি-লিলি—ওরে লীলা কোথায় গেলি তুই মা?

লিলি চা নিয়ে ঘরে ঢুকছিলো। মৃদুহেসে বলে সে,

ঃ কি হয়েছে বাবা?

আরে কি হয়নি তাই বল-ওরে তুই যে এবাড়ির লক্ষী, স্বরস্বতি এবাড়ীতে পা দিতে না দিতেই আমার মিলের শ্রমিক ধর্মঘট বন্দ হলো। এদিকে যাকে আমি খুজে বেড়াচ্ছি সে যে বেচে আছে!

ঃ কে সে?

আমার ছেলে সুশোভন।

শোভনদা বেচে আছেন?

হ্যাঁ, এই মাত্তর সে ইউ, এস, এ, থেকে ফোন করলো। আমি তাকে অপদার্থ ইমবেসিলেস, কাওয়ার্ড বলে একদিন গালাগাল করে ছিলাম বলে সে রাগ করে আমেরিকা চলে গেছে। সেখানে থেকে কি করেছে জানিস? নিজে আয় করে পড়েছে, টেক্সটাইল টেকনোলজির উপর মস্ত ডিগ্রী নিয়েছে। খুব শীঘ্র ফিরে আসবে! এই সময়টায় চা কেন, কাঞ্চালীকে বল মিষ্টি আনতে, মিষ্টি মিষ্টি—

বাচ্চাদের মতো উৎফুল্ল দেখাচ্ছিলো বোস বাবুকে। কিন্তু সহসা তার চোখ মুখ কি এক কষ্টে মলিন হয়ে গেলে ধরা গলায় বললেন তিনি,

কিন্তু এতো সুখ যার দেখার—সে কোথায়—সে তো নেই—সে নেই। চোখ ফেটে/ফোঁটায় ফোঁটায় অশ্রু নেমে আছিলো বোস বাবুর!

লিলি কাছে এগিয়ে গিয়ে বললো,

ঃ বাবা স্থির হয়ে বসো তুমি! আমি মিষ্টির ব্যবস্থা করছি।

মিষ্টির প্লেট হাতে নিয়ে ঘরে ঢুকতে গিয়ে লিলি দেখে বোস বাবু হুইস্কির বোতল খুলে বসেছে।

ঃ বাবা! চমকে ওঠেন বোস বাবু। আজ কেন জানি তার এই সাধারণ মেয়ে লিলিটাকে দেখে ভয় করছে।

ঃ এসব তুমি খেতে পারবে না বাবা! লিলি নিজ হাতে বোতল আর গ্লাসগুলো একে একে জানালা দিয়ে নীচে ফেলে দিতে লাগলো

লিলি—লিলি— একি করছিস তুই?

ঃ ঠিকই করছি আমি। এইসব ছাইপাশ গিলে গিলে, না ঘুমিয়ে, না

বিশ্রাম নিয়ে নিজের অবস্থাটা কি করেছো তুমি—একবার দেখেছো। এই নাও মিষ্টি! নাও বলছি...ও, না খাইয়ে দিলে চলবে না বুঝি?

নিজ হাতে মিষ্টি তুলে দেয় লিলি বোস বাবুর মুখে, একটু হেসে বোস বাবু বলেন,

ঃ তুই যে এ বাড়ীর গৃহলক্ষী—তোর মতো মা যার ঘরে নেই তার যে গৃহশূন্য। সেই এলিই যদি এতো দেরী করে এলি কেন মা?

ঃ আর কোনো কথা নয়। এখন কিছু খাবে চলো। তারপর চুপচাপ শুয়ে পড়বে।

মিলের কাজের কি একটা জরুরী ব্যাপারে বোস বাবু সাত দিনের জন্য দিল্লী চলে গেলেন। এবাড়ীর সম্পূর্ণ দায়িত্ব তিনি লিলির হাতে তুলে দিয়ে গেলেন।

ঠিক বিদায়ী মুহূতে তিনি দম দম এয়ার পোর্টে দাঁড়িয়ে একটি কথাই কেবল লিলিকে বলে গেলেন আর সেটা হচ্ছে,

ঃ দ্যাখ লীলা, এই বাড়ী ঘর দোর সবকিছুর দায় দায়িত্ব যখন আমি তোর কাছে দিয়ে যাচ্ছি—এমনকি আমার ব্লাংক সই করা কয়েক লক্ষ টাকার চেক আর এই চাবীর গোছাঃ তখন একটা জিনিসই আমি তোর কাছ থেকে বিনিময়ে আমি আশা করবো—

ঃ কি বাবা?

ঃ তোর চলায় বলায়, পোষাকে আশাকে—এমনকি অহংকারে, কোথাও যেন এতোটুকু ফাঁক ত্রুটি বা খুত আমি দিল্লী থেকে ফিরে এসে খুজে না পাই—

যাতে করে কেউ আমাকে বলতে সাহস পায় না যে, বারীন বোস

যাকে মেয়ে হিসেবে বুকে টেনে নিয়েছে সে বারীন বাবুর নিকটজন হবার অনুপযুক্ত। তোমার সেই মন মানসিকতা সৃষ্টীর জন্ত প্রয়োজনে তুমি দু'হাত ভরে উড়াবে—প্রয়োজনে আলমারী থেকে শাড়ি বের করে প্রতিদিন একটা করে পড়বে—দরকার হলে তোমার স্বর্গবাসিনী মায়ের সমস্ত অলংকারের বেটা যখন ইচ্ছে পড়বে! আমাকে এ ব্যাপারে পূর্ণ খুশী করা মানেই পিতা হিসেবে আমাকে পাওয়ার দাবিকে পূর্ণ প্রতিষ্ঠিত করা। ও, কে, গুড নাইট!

সাত

বোস বাবুকে এয়ারপোর্টে বিদেয় দিয়ে এসেই সেই রাতে দরজা জানালা ভেতর থেকে ভালো করে লাগিয়ে নিয়ে লিলি বোস বাবুর আলমারী ও ড্রয়ার খুলে সমস্ত শাড়ী, গহনা আর টাকা পয়সা বের করলো।

সবকিছু একে একে হাতিয়ে হাতিয়ে দেখলো। তারপর নিজের পছন্দ মতো তা একে একে সাতটা ভাগে ভাগ করে তাকে তুলে রাখলো। শনিবারে কোন শাড়ী কোন ব্লাউজ কোন গহনা পড়বে—রবিবারে কোন সেট এভাবে এক সপ্তাহের আয়োজন করে রাখলো সে। পরদিনই সে দাড়োয়ান ডেকে, নতুন একজন পাচক বামুনকে এ্যাপয়েন্টমেণ্ট দিলো। বেশ দেখে শুনে যাচাই করেই নিলো সে তাকে। নিজের জন্ত রাখলো একজন অল্পবয়েসী আয়া—নাম তার বিন্দুবাসীনী।

দু'দিনেই লিলির ঠমক-দমক চাল চলন, বেশ ভুষা একেবারে পাল্টে গেলো। বিন্দুকে নিয়ে খাট পালঙ্ক কোনটা কোথায় বসাবে—সে সব ঠিক করে নতুন ভাবে গুছিয়ে নিলো আগোছালো বাড়ীটা। পাচক নাথুরামকে ডেকে বুঝিয়ে দিলো ব্রেক ফাষ্ট কটায় প্রস্তুত করতে হবে, ডিনার কটায় দেবে, টিফিনে কবে কি আইটেম থাকবে ইত্যাদি।

মালী কাঙ্গালী ও দারোয়ান সন্ত সিং এই আগন্তুক হত ভাগিনীর ভাগ্যের এই অভাবিত উন্নতি দেখে মনে মনে গজরাচ্ছিলো। একদিন বিকেলে মার্কেট থেকে গাড়ী নিয়ে ফেরার পর তাদের দু'জনকে

ডাকলো লিলি। প্যাকেট থেকে নতুন উর্দি, পেতলের নেইম প্লেট, সাদা ইউনিফর্ম বের করে তা সন্তুর হাতে দিয়ে বললো লিলি,

সি জি এটাই তোমার পোষাক! আজ থেকে যতদিন বোস বাবুর বাড়ীর দারোয়ান থাকবে তুমি প্রতি বছরে এমন পোশাক দু'বার পাবে - একটা শীতকালীন আরেকটা গরম কালের। আর কাঙ্গালী চরন - এই নাও তোমার নতুন ধুতি গামছা ও জামা। সেই সঙ্গে রাখো এটা বেতনের উপরি পাওনা। কেন দিলাম জানো? এটাকা দিয়ে তোমার চর্ম রোগের চিকিৎসা করাবে - পরিস্কার পরিচ্ছন্ন থাকবে আর এরপর থেকে ন্যাড়া মাথা না করে সুন্দর করে চুল কাটাবে - মাথায় তেল দেবে!

বিস্ময় ও আনন্দে সন্তু ও কাঙ্গালী হাসবে না কাঁদবে, বুঝতে পারলো না। পরদিন সকালেই বিন্দুকে নিয়ে নার্সারীতে গেল লিলি নতুন নতুন ফুলের গাছ, বিদেশী পাতা বাহার ও অবলুপ্ত কিছু ফুলের চারা কিনে আনলো সে, সঙ্গে মস্ত একটা একুইরিয়াম।

বেলা বারটায় এবাড়ীর রান্না ও দুপুরের খাওয়া শেষ হয়। লিলি তার শ্যাম্পু করা চুল হেয়ার ড্রাইয়ারে শুকোবার পর একটা হাল্কা ম্যাগাজিন হাতে নিয়ে নিজের বেডরুমে শুয়ে ছিলো। ঠিক এই সময় বাইরে কলিং বেল বেজে উঠলো - লিলি হাঁক মারলো,

: বিন্দু দ্যাখতো ড্রয়িং রুমে কে? বিন্দু ড্রয়িং রুমে গিয়ে ঘুরে এলো লিলির কাছে। বললো,

: দিদি, কে একজন সুন্দর ভদ্দর লোক - সুটকেস নিয়ে বসে আছে

: কাকে চান উনি?

: জানিনা।

: জিজ্ঞেস করলি না?

: করেছি - কোনো উত্তর দিচ্ছেন না। কেবল চুপচাপ সিগ্রেট টানছেন।

আর জিজ্ঞেস করলেন, তোমার নাম কি? আমি আমার নাম বললাম। উনি আর কিছু বললেন না!

কই – চলতো দেখি – আজব ব্যাপার তো!

ম্যাগাজিনটা উল্টে বালিসের পাশে রেখে, বিন্দুর সঙ্গে বেডরুম পেরিয়ে ড্রয়িংরুমে এলো লিলি। দেখলো বেশ ওয়েল স্যুটেড ওয়েল বুটেড সুদর্শন জনৈক ভদ্র যুবক সোফায় বসে চুপচাপ সিগ্রেট টানছেন। লিলি সোজাসুজি তার মুখোমুখী পড়ে গেলো। দু'হাত তুলে নমস্কার করলো লিলি,

ভদ্রলোক তার প্রত্যুত্তর দেবার প্রয়োজন বোধ করলেন না যেন। একটু গম্ভীর ভাবে উচ্চারণ করলেন,

ঃ তুমি?

লিলিরও মুখ থেকে বেরিয়ে এলো,

ঃ আপনি?

ভদ্রলোক আবারও বললেন,

ঃ তোমাকে তো ঠিক চিনলাম না!

লিলি বললো.

ঃ আমিও আপনাকে ঠিক চিনলাম না!

ভদ্রলোক এবারে সোজা হয়ে বসে বললেন,

কি নাম তোমার?

ঃ লিলি!

ঃ তা এখানে কেন?

লিলি বললো,

ঃ প্রশ্নটা আমিও আপনাকে করতে পারি—আপনি এখানে কেন?

ক্ষেপে উঠলেন যেন ভদ্রলোক।

বেশ ঝাঝের সঙ্গে বললেন,

: তুমি কি আমার সঙ্গে জোক করছো? আমি জানতে চাই—এখানে কি চাও তুমি?

লিলিও একই রকমভাবে তেড়ে উঠে বললো,

: আমিও আপনার কাছে জানতে চাই—আপনি এখানে কেন—কাকে চান?

ওহ—ইউ সাট আপ ননসেন্স।

গর্জে, উঠে দাঁড়ালেন ভদ্রলোক। বললেন,

: তুমি জানো আমি কে?

সমোভাবে তেতে উঠলো লিলি। বললো,

: আপনি জানেন আমি কে?

: ওই, ইউ. ষ্টুপ ননসেন্স—বেশী অডাসিটি করলে আমি তোমাকে বের করে দেবো!

: তাই নাকি? বেশ দেখছি আমি—কে কাকে বের করে?

: ওহ—বাডি ডেভিল—তুমি আমাকে কি চেনো

আপনিও কি আমাকে চেনেন নাকি?

: শোনো মেয়ে, আমি জানিনা তোমার মাথা খারাপ কিনা। আমার নাম সুশোভন বোস—এ বাড়ীর মালিকের ছেলে—আই মিন এবাড়ীর মালিকও বলতে পারো!

: সুশোভন বাবু! আপনি!

: হ্যাঁ, আমি!

লিলি ক্ষানিকটা হকচকিয়ে গেলো। লজ্জিত কণ্ঠে বললো,

: আমি ঠিক আপনাকে এর আগে দেখিনি কিনা! সারি এসকিউজ মি! বসুন, বাবা অবশ্য আপনার আসার কথা বলেছিলেন আমাকে। বাবা! বাবাটা আবার কে?

: কেন, বারীণ বোস! আপনার বাবা যিনি আমারও বাবা তিনি!

: তার মানে? তুমি কি আমার কাছে ভাত্ সম্পর্কের দাবী জানাচ্ছো!

: আজ্ঞে না, তার থেকে বড় অধিকার আমাকে দেয়া হয়েছে।

: কি সেটা ?

বারীন বোসের অবর্তমানে এ বাড়ীর সম্পূর্ণ কর্তৃত্ব।

আই সী।

একটু ঘুরে দাড়িয়ে আরেকটা সিগ্রেট জ্বাললেন সুশোভন বোস। বললেন,

তা অধিকারটা কে দিলে ?

স্বয়ং বারীন বোস।

কই' এমন কথা তো তিনি ট্রাংকলে কখনো বলেননি আমাকে। গেটে ঢুকবার সময়ই কেবল জানতে পারলাম একজন দাসী কেবল এ বাড়ীর কর্তৃত্ব করছে।

দাসী ! তা মিথ্যে শোনেন নি। সেবা দিয়ে দাসত্ব করে যিনি কর্তৃত্ব নেন তিনিই তো প্রকৃত কর্তা। শুধু হুকুম চালিয়ে কর্তৃত্ব করা যায় না। আর সে কর্তৃত্বও বেশীদিন টেকে না।

তাই নাকি।

নিশ্চই তাই। তা না হলে, আলো দিয়ে, জল দিয়ে, ফুল দিয়ে' ফল দিয়ে, যিনি নিত্যদিন আমাদের সেবা করছেন তিনি আমাদের প্রভু হতেন না। যাকগে, আপনি বোধ হয় আপনার বেডরুমটাতে যান নি। এই নিন চাবী। কাপড় চোপড় ছেড়ে বিশ্রাম করুণগে। আমি আপনার খাবার ব্যবস্থা করছি। নিন, চলুন-রুমটা দেখিয়ে আসি।

লিলির কথায় এমনকি একটা ছিলো যাকে অস্বীকার করতে না পেরে, ভালো মানুষটির মতো সুশোভন তাকে অনুসরন করলো। নিজের কক্ষে এসে সুশোভন তো বিস্ময়ে হতবাক। তোয়ালে, ধুতি, প্যান্ট, পাতলুন হাত ধোয়ার সাবান, বাসিলে টুথপেষ্ট এমনকি ব্রুশটা পর্যন্ত এমন সুসজ্জিত করে রাখা হয়েছে যে, কোন একটা প্রয়োজনীয় বস্তুর জন্য

কাউকে ডাকবার প্রয়োজন নেই।

সুশোভন ঘরে ঢুকতেই লিলি বিদায় নিলো। সুশোভন হাত মুখ ধুয়ে যখন বেড়ে এসে বসলো তখন এক ট্রে ভর্তি গরম গরম লুচি, ফুলরা ও দৈ নিয়ে সাধারন দাসীর পোশাক পরিহিতা লিলি এসে ঘরে ঢুকলো।

সবিস্ময়ে তার দিকে তাকিয়ে রইলো সুশোভন। ট্রে-টা টি-পয়ে গুছিয়ে রেখে, টি-পয়টা বেডের কাছে এগিয়ে আনলো লিলি। সুশোভন ভয়ানকভাবে চমকে আছে। বাকরুদ্ধ তার। বললো,

ঃ একি ব্যাপার! এই দেখলাম রাজকন্যার বেশে আর এখন দেখছি দাসী রূপে।

লিলি মিষ্টি হেসে তশ্তরীতে খাবারগুলো এগিয়ে দিতে দিতে বললো, যেভাবে আমাকে পেলে খুশী হন—সেভাবেই এলাম। তাছাড়া প্রকৃত অর্থে আমি তো রাজকন্যা নই—আমার প্রকৃত পরিচয় দাসির। নিন, ফুলরাগুলো জুড়িয়ে গেলে খেয়ে মজা পাবেন না।

ঃ ফুলরা! এতো আমার ভারী পছন্দ। তারপর দৈ-ও দেখছি---আমি যে এসব খেতে ভালোবাসি তাইবা তুমি জানলে কি করে?

ঃ সেবিকার ধর্ম সেবা তাকে এসব না জানলে কি চলে?

কফির কাপটা প্রিচ দিয়ে ঢেকে দিল লিলি। সুশোভন একটা কামড় দিয়েছে তখন ফুলরায়।

ঃ বাহ—চমৎকার। সেই কবে মায়ের হাতে এমন ফুলরা খেয়েছিলাম—আর কখনো খাইনি!

ঃ থাক, আপনার শোকেই মা দেহত্যাগ করেছেন, আপনি একথা তুলে আর মন খারাপ করবেন না!

নাস্তা করতে করতে সুশোভন বলে,

ঃ জানো লিলি, বাবার জন্য এটা ছিলো এক ধরনের গোয়ার্তুমী আর আমার জন্য নীতিগত ব্যাপার। তাই গৃহত্যাগ না করে আমার

কোনো উপায় ছিলো না। তবে এর ফলাফলটা সামান্য লাভজনক ও চিরদিনের অনুতাপের বিষয়। মাকে হারিয়েছি আমি—আর পেয়েছি একটা ডিগ্রী, টেক্সটাইল টেকনোলজির উপর এতবড় ডিগ্রী—বাঙ্গালী-দের আর কারো নেই।

একটা দীর্ঘশ্বাস চেপে চেপে ছাড়লো লিলি।
বললো,

: ঈশ্বর মঙ্গলময়—যা করেন তিনি ভালোই করেন। ভগবান মাকে স্বর্গধামে স্থান দিন। আর আপনিও এবার জলদী করে মিল দুটোর দায়িত্ব নিয়ে বাবাকে একটু বিশ্রাম দিন।

: হাঁ তাই করবো। তবে তার আগে একটি কথা?

: বলুন?

: তুমি তো আজো রহস্যময়ী। তোমার অনেক কিছুই তো এখনো জানা হলো না।

: সময় মতোই জানবেন।

: এখন বলতে দোষ আছে কি?

: দোষ নেই, তবে আমার হাতে অনেক কাজ রয়েছে।

খাওয়া শেষ করতেই নিজ হাতে জল ঢেলে সুশোভনের হাত ধুইয়ে দিলো লিলি। এমন কি মুছিয়েও দিলো। সুশোভন বললো

: সেবা তো ভালই শিখেছো। এবার দাও তো দেখি—ব্যাগ থেকে নতুন সিগ্রেটের প্যাকেটটা।

লিলি সিগ্রেট বের করে দিলো। সুশোভন সিগ্রেট জ্বেলে একটা টান দিয়ে; ঘড়ি দেখে বললো,

: কাজের কথা বলে ভালোই করলে— আমাকেও তো এক্ষুনি একটু বাইরে যেতে হবে।

: এক্ষুনি যেতে হবে? এতোটা জার্নি করে এসে একটু বিশ্রাম নিলে কি ভালো হতো না?

: বিশ্রাম! সে মৃত্যুর পরে। জীবন মানেই কাজ।

: তা এখন কোথায় যাওয়া হবে?

: প্রথমতঃ একটু মিলের দিকে। ভালো কথা, বাবা নাকি দিল্লীতে? কবে ফিরবেন?

: আরো দিন পাঁচেক পরে!

সুশোভন উঠে দাঁড়ালো। লিলি টে নিয়ে চলে গেলো। ফিরে এসে দেখলো সুশোভন নতুন পোষাক পড়ে টাই বাঁধছে। লিলি নতুন বেড কভার লাগাতে লাগলো। আয়নার মধ্যে লিলিকে দেখে সুশোভন বললো,

: একটা কথা বলতাম –

: বললেই হয় – ভূমিকা নিষ্প্রয়োজন।

: একটু বাহিরে যাওয়া কি সম্ভব আমার সঙ্গে?

: কাকে বলছেন?

: ঘরে আর কে আছে।

: এক্ষুনি বেরোবো কি?

: নাঃ কাপড় চোপর পাল্টে নিয়ে। মানে আমার সঙ্গেই গাড়ীতে যেতে হবে কিনা, তাই –

: তাতে এ কাপড়ে দোষ কি?

: না, মানে –

লোকে বলবে, দাসীকে নিয়ে বেড়াচ্ছেন – এইতো?

না, মানে, ভাল পোশাকগুলো থাকতে –

বেশ, মালিকের মনতুষ্টিই সেবিকার ধর্ম। আসছি আমি –

o o o o o o o

গাড়ী চলছিলো কোয়ালিয়রের দিকে। পেছনের সীটে লিলি ও সুশোভন। জরোয়া সেট গহনা ময়ূর কণ্ঠী কাঞ্চিভরম শাড়ী তাতে সিঁদুর রঙের ব্লাউজে দারুন মানিয়েছিলো লিলিকে। গাড়ীর মাঝে হালকা ফুরফুরে এসেন্সের সুবাস। সুশোভনের মনটা কেমন করে উঠছিল। সে আপন মনে একটার পর একটা সিগ্রেট জ্বেলে যাচ্ছিলো। নিজেকে সম্বোরন করতে না পেরে সে মাঝে মধ্যেই চোরা চোখে গাড়ীর ভিউ মিররের মধ্যে দিয়ে লিলির ফর্সা লম্বা দুটো মৃনাল বাহুএক হারা দেহের গড়ন, টিকালো নাক, জোরা লম্বা ভ্রু, দুধেল মসৃন মরাল গ্রীবা আর মায়াবী তারকা চোখ দুটোর পানে চাইছিল। কিন্তু তাতেও রেহাই নেই তার। মাঝে দু'দুবার এই গোপন দৃষ্টীর লুকোচুরীটা লিলির চোখে ধরা পড়ে গিয়েছিলো। বেচারী লজ্জায় লাল হয়ে গেল।

লিলি এক সময় বললো তাকে,

: এত সিগ্রেট খাওয়া ভালো নাকি ? অবশ্য মালিকের ব্যাক্তিগত ব্যাপারে দাসীর নাক গলানোটা ঠিক নয়। সুশোভন বললো,

উযুক্তা দাসী হলে, তাকে সব খবরই রাখতে হয়।

: তাই নাকি ? তাহলে বলছি. যে কোন সিগ্রেটেই নিকোটিন রয়েছে. যা স্বাস্থ্যের জন্য সুখপ্রদ কিছু নয়। সুশোভন সংক্ষেপে জবাব দিল,

: টেন শনে রয়েছি।

চোখ বাঁকা করে জিজ্ঞেস করলো লিলি,

কিশের টেনশন, দাসীকে বলা যায় কি ?

টেনশনটা দাসীকে নিয়েই।

যেমন ?

সে কি দাসীর যোগ্যা না, আরো বেশী উপযুক্তা, তাই ভাবছি—

সাধারণ দাসীকে নিয়ে প্রভুর এ ভাবনা সাজেনা।

এ দাসী যে সে দাসী নয় —এ অসামান্যা-অনন্যা ?

তাই নাকি ?

খিল খিল করে হাসলো লিলি। বললো,

এটা দাসীর ভাগ্য ?

একটুক্ষণ চুপ থেকে সুশোভন বলে.

চলো গঙ্গার ধারে যাই—

লিলি বলে'

কাজটা গঙ্গার ধারে হলে প্রভু যাবেন বৈকি ! তাতে দাসীর অনুমতির প্রয়োজন হয় কি ?

সুশোভন এবারে চট করে লিলির দিকে ঘুরে বসে। ড্রাইভারকে হুকুম দেয় —গঙ্গার ধারে যেতে। সুশোভন বলে,

: আচ্ছা বলতো তুমি কে ?

কেন, একজন মেয়ে মানুষ ও আপনাদের সেবিকা !

তোমাকে তার থেকেও বেশী কিছু মনে হয়।

এমন হওয়ার কারণ ?

: এই দেখনা মাত্র চার ঘণ্টা তোমার সাথে আমার আলাপ—তাও একটা ঝগড়া ঝাটি থেকে, কিন্তু।

কিন্তু কি বলুন ?

সুশোভন একটুখানি ঝুঁকে পড়ে লিলির দিকে, আবেগময় কণ্ঠে বলে,

: বড্ড আপনার মনে হয় ।

: তাই নাকি ?

আবার হাসিতে লুটিয়ে পড়ে লিলি । সুশোভন বলে,

: তুমি হাসলে আমি রাগ করবো কিন্তু !

: কেন ?

: মনে হয় তুমি উপহাস করছো !

: অধীনের প্রতি একি নির্মম বাণী ! আমি উপহাস করতে পারি মনিবকে? এযে বড় ধৃষ্টতা ! গর্দান যাবে যে ।

: তেমন ভয় নেই ।

: বের করে দিতে চেয়েছিলেন তো বাড়ী থেকে । মনে নেই !

: তুমিও বের করতে চেয়েছিলে আমাকে !

: সেটা রাগের মাথায় !

: চলো, গঙ্গার ধারে নেমে হাটি ।

ওরা হাটতে হাটতে গঙ্গার ধারে এলো । সোনালী সন্ধ্যা নামছে চারদিকে, পাখীদের নীড়ে ফেরার কলধ্বনী ।

সুশোভন বললো,

চলো ঐ বেঞ্চটায় একটু বসি ?

ওরা তাই করে । সুশোভন বলে

: বাদাম খাবে ?

মনিবের যেমনটি ইচ্ছে !

গঙ্গার ধারে তখন বায়ুসেবী বহু লোকের ভীড় । এক দল যুবতী (হয়তো কলেজের মেয়ে) ওদের পাশেই দল বেধে আড্ডা মারছিল । একটা মেয়ে ওদের দেখিয়ে বললো,

দেখছিস কি দারুন মানিয়েছে পেয়ারটাকে ? ঠিক যেন অমিতাভচচন আর রেখা । আর এক বান্ধবী বলে

: ধ্যাৎ ওরা পেয়ার হতে যাবে কোন দুঃখে ?

: তাহলে !

: ডার্লিং—ডার্লিং—

সবাই হেসে উঠে। ওরা লজ্জা পায়। লিলি বলে,

ঃ ছিঃ! ওরা কি ভাবছে!

ভাবুক। কারো ভাবনায় কারু হাত নেই!

তবু!

লিলি কৃত্রিম লজ্জায় উঠে যাচ্ছিলো। দুটো মেয়ে তার পথ আগলে দাঁড়ালো। একজন বললো,

একটা কথা!

লিলি [illegible] তাকালো। অন্য মেয়েটি বললো,

সত্যি বলতে হবে লিলি বলে,

কি?

ঃ আপনার বিবাহিত দম্পতি না লাভের পেয়ার। ওর সঙ্গে আমার দশ টাকা বেট হয়েছে। লিলি বললো,

কোনটাই না!

যাহ্ সত্যি বলুন না—প্লিজ নয়ত হেরে যাবো আমি।

ওকে জিজ্ঞেস করো!

লিলি মেয়ে দুটোকে সুশোভনকে দেখিয়ে দিলো। ওরা বললো,

ঃ সেই ভালো। চল যাই—মেয়েরা মিথ্যুক বেশী! ওরা এবারে সুশোভনকে চেপে ধরলো। আমতা আমতা করছিল সে। যে মেয়েটা বলেছিল ওরা নবদম্পতি—তার দিকে সুশোভন বললো,

আপনাদের কাউকেই হারতে বা জিততে হবেনা। কারণ ব্যাপারটা মাঝামাঝি সত্য।

তার মানে?

মানে হচ্ছে— আপাতত ঃ আমাদেরকে প্রেমিক যুগল বলতে পারেন।

অন্যপক্ষের মেয়েরা নেচে উঠলো,

ঃ তাহলে আমরা জিতেছি। সুশোভন বলে,

অর্দ্ধেকটা। কারণ এদেরটাও ঠিক শিগ্‌গিই আমাদের বিয়ে হবে।

ওরা গাড়ীতে উঠার পর লিলি বললো,

ঃ ওদেরকে একথা বলার মানে? সুশোভন বলে, কোন কথা?

ঃ ঐযে বলা হলো শীগ্‌গিই আমাদের ইয়ে হবে।

বারে যা সত্যি তা বলবো না?

সত্যি?

আমি তোমাকে বিয়ে করতে চাই।

লিলি রাগের মাথায় বললো।

আমি কিন্তু গাড়ী থেকে নেমে যাবো?

ঃ খবরদার। ওর হাতটা চেপে ধরলো সুশোভন। চারদিকে অন্ধকার ডানা মেলছে। ওরা গাড়ীর ভেতরে বাতি জ্বালেনি। অনেক্ষন অন্ধকারে চুপ চাপ ওরা। সুশোভন ওর বাহুলগ্ন হয়ে বসেছিলো। এক সময় সে লিলির কানেরকাছে মুখ নিয়ে পরম আবেগ ভরে বললো,

সত্যিই লীলা তুমি আমার এ প্রস্তাবে রাজী নও? বলো?

আমি কিছু জানিনা!

অন্ধকার গাড়ীতে কি করে যে এক সময় নিজেদের অজ্ঞাতে দুজনার কাছে এলো, ওরা জানেনা। বাড়ী ফেরার আগে সুশোভন শুধু বললো,

ঃ বাবা দিল্লী থেকে ফিরে আসুক আগে?

প্রস্তাব শুনেই আনন্দে আত্মহারা হলেন বারীন বোষ। শুভ দিনের শুভক্ষন দেখে ওদের দু'জনার শুভ বিবাহ দিলেন তিনি।

০ ০ ০ ০

নতুন বর ও বধু সুশোভন ও লিলি সে দিন পার্কে বসেছিল। সুশোভন দেখলো লিলি কি চিন্তা করছে। সে বললো,

ঃ পার্কে এলেই তোমার মন খারাপ হয় অথচ এতো আনন্দের জায়গা থাকতে রোজই ও সময় তুমি পার্কে আসো ব্যাপার কি?

লিলি একটা নিঃশ্বাস ছেড়ে বলে,

জানো তোমাকে আমার যে দিদির কথা বলেছিলাম। সেদিন পার্কে এসেমনে হলো ও আমার দিদি মিলিই হবে। কিন্তু।

কিন্তু কি ?

: ভাল করে দেখতে পারিনি তাকে। তার আগেই সে চলে গেলো কিন্তু

: কিন্তু কি ?

: কিন্তু দিদি অমন দামী শাড়ী গহনা পাবে কোথায় তাই ভাবছি।

: তুমি কিভাবে পেলে ? ভগবানের কৃপার শেষ নেই। চলো একটু হেটে বেড়াই।

ওরা হাটতে হাটতে পার্কের বাইরে এলো।

এগার

জি.টি' রোডটা ছেড়ে মিলি একটা গলিতে ঢুকল রেলওয়ে কোয়ার্টারে যাওয়ার জন্য। বিমলের সেই পরিচিতা মহিলা মিসেস অদিতি সেনগুপ্ত রেলওয়ে কোয়ার্টারে থাকে। তার গন্তব্যস্থল এখন সে খানেই।

দ্রুত পায়ে রাতের অন্ধকারে বিমলের সেই পরিচিত মহিলা অদিতি সেনগুপ্তর রেলওয়ে কোয়ার্টারে এসে উঠলো। ভদ্র মহিলা তার করুন কাহিনি শুনে আঁতকে উঠলেন।

দেখছি, কি করা যায়। রাত্রিটা আমার ঘরে তুমি কি থাকবে?

না, আমি এক মুহূর্ত থাকতে চাই না। মিসেস সুতপা ঘোষাল আমার সব টাকা ছিনিয়ে নিয়েছে। ওকে পুলিশে ধরিয়ে দেবার ব্যবস্থা করবেন দয়া করে। আর আমাকে হাত খরচের কিছু টাকা দিন। আমি কোলকাতায় ফিরে যেতে চাই।

ঠিক আছে। সে আলমারী থেকে একশোটা টাকা বার করে তার হাতে তুলে দিল। একান্তই যদি যেতে চাও তাহলে আর দেরী করো না মিলি, এক্ষুনি চলে যাও এখান থেকে।

আঃ. আপনাকে কি বলে যে ধন্যবাদ দেব, বুঝতে পারছি না সংসারে আপনার মত কিছুলোক থাকলে আমাদের মত অসহায় মেয়েদের আর দুঃখ থাকত না।

অদিতি ওর পিঠে সস্নেহে হাত রাখল, ওইস ইউ গুড লাক। আর দেরী করো না, এবার যাও

ভোর হয়ে আসছিল। ছ'টায় কোলকাতায় যাওয়ার একটা গাড়ী ছিল। মিলি জোরে হাঁটছিল ষ্টেশনের দিকে।

অদিতির কথাটা আবারও মনে আসতেই, আরেকটা মানুষের মুখ তার স্মৃতির পটে ভেসে উঠলো। কানু। সি, আই, ডি, র, লোক বটে, তবু মনুষত্ববোধ রয়েছে। ওর চোখ দুটোতে কি একটা মায়া

দেখেছিল মিলি—যা এ জীবনে আর কোথাও দেখেনি। একবার সে মনে মনে প্রার্থনা করলো,

ঃ হে ঈশ্বর—হে আমার স্রষ্টা ও মালিক-আমি তো তোমাকে কখনো চর্ম চোখে দেখিনি। এই অধমের মিনতি কি তুমি শুনতে পাচ্ছো? আর একবার আমার কানুর সঙ্গে তুমি আমাকে দেখা করিয়ে দাও। তোমার জগতে আমি ভালো মানুষের মুখ দেখে তাপিত বক্ষটাকে শীতল করতে চাই।

বিধাতার কথা মনে আসতেই আবার একটু যেন বিদ্রূপ এসে বাঁকিয়ে দিলো মিলির ঠোঁটের কোনটা। সে দ্রুত হাটছে। ষ্টেশনের সিঁড়ি দিয়ে উঠতেই একজন পুলিশ অফিসার তার সামনে এসে দাঁড়াল আচমকা।

ঃ হ্যাণ্ডস আপ। পিস্তলের সামনে হাত তুললো মিলি। এবারে সে পুলিশি খপ্‌পরে—অদূরেই একটা পুলিশি পিকআপ ভ্যান দাঁড়িয়ে ছিলো। পুলিশ অফিসারটি এক পলকে ভ্যানটি দেখিয়ে মিলিকে জিজ্ঞেস করলো,

আপনার নাম মিলি, ওরফে ছদ্মনাম রাধা নয় কি? গলা শুকিয়ে গেলো মিলির। ঢোক গিললো।

হ্যাঁ।

লোকটা আর কোন কথা না বলে গান পয়েন্টে ওকে ভ্যানে তুলে, সামনের ড্রাইভারকে হুকুম করলো,

ঃ ষ্টার্ট! হু হু করে রাজ পথ বেয়ে গাড়ী ছুটে চললো। আধঘণ্টা পর একটা হলুদ ভাঙ্গা বাড়ীর বিশাল ফটকের মধ্য দিয়ে ভ্যানটা ঢুকে গেলো। থামলো। ওকে নিয়ে আসা হলো সাত পাঁচ ঘুরিয়ে দ্বীতলের একটা গুপ্ত কোঠায়। বাইরের ছালতোলা, রং চটা বিল্ডিংটাতে এতো সুন্দর চেম্বার কল্পনা করাই অসম্ভব। সে যে চেম্বারে ঢুকলো, তাতে মোলায়েম বাতি দুধেল আলো। সারা ঘরের দেওয়াল হালকা বাদামী ডিস্টেম্পার করা। ঝিঁ ঝিঁ পোকার মতো শব্দ করে ঘরটার শৈত্য-তাপ নিয়ন্ত্রন করছে একটা এয়ারকুলার। চেম্বারে হালকা ঠাণ্ডা বাতাসের মধুর প্রলেপ।

একদিকে মস্তবড় একটা সেক্রেটারিয়েট টেবিল। ওপাশে রিভলভিং চেয়ারে পা তুলে দিয়ে, কে একজন গোঁফওলা সানগ্লাস পরা হাই অফিসিয়াল পাইপ টানছে। এই অফিসারটি মিলিকে নিয়ে তার সামনে গিয়ে ঠকাশ করে সেলুট ঠুকে বললো,

: স্যার হিয়ার ইজ সি! ব্যাস—এরপরেই সে বিদায় নিলো। রিভলভিং চেয়ারে ভদ্রলোক। চেয়ারটা আয়েশী ভঙ্গিতে দোলাতে দোলাতে সামনে একটা গদি আটা চেয়ার দেখিয়ে বললো,

: বসো,দাঁড়িয়ে কেনো?

: কে! চমকে উঠে মিলি। কণ্ঠটা যেন খুব পরিচিত।

: এখনো চিনতে পারছো না? উনি সানগ্লাসটা সরিয়ে নিলেন। নকল গোফটা সরিয়ে নেয়। মিলি প্রায় চেঁচিয়ে ওঠে,

: কানু! তুমি—মানে আপনি।

: উত্তেজিত হয়ো না। সি, আই, ডি,র মানুষের উত্তেজিত হতে নেই। মিলি বলে,

: কিন্তু আমিতো সি, আই, ডি, নই!

তবু তুমি তাদেরই লোক! কথাটা যেন কেমন রহস্য ভরা। কানু গম্ভীরভাবে টেবিলে ঝুঁকে পড়ে কয়েকটা হাতে আকা ম্যাপ তুলে মিলিকে দ্যাখালো। বললো,

: দিস ইজ আওয়ার নাম্বার নাইন টার্গেট। সমস্ত ঘাটির তল্লাসী শেষ। তোমার মামলারই অপেক্ষায় ছিলাম আমরা। জানোতো মিঃ অশোকের চৌদ্দ বছরের কারাদণ্ড হয়েছে। অবশ্য ওকে আরো পরে ধরলে কাজে সুবিধা হতো। তুমি জল ঘোলা করে দিলে। তাই ওকে আটক করতেই সমস্ত দল হুশীয়ার হয়ে গেল। কিছু ক্ষতি হয়নি তাতে—একটু কষ্ট বেড়েছিলো। যাকগে, তোমাকে নিয়ে আজ থেকেই তিনদিনের এই অভিযান চলবে। সমস্ত জাল গুটানো শেষ। তোমার কাজ হলো ঐ সব নিষ্ঠুর প্রকৃতির ক্রিমিন্যালদের চেহারাগুলো আইডিন্টিফাই করে দেবে। অবশ্য তোমার কষ্টের বিনিময়ে তুমি পাবে। যা চাও—তা-ই পাবে। চার দিনের কাজ তিন দিনেই শেষ হয়েছে। সারা ভারতের মূল ক্রিমিন্যালদের মিলি ধরতে সাহায্য করেছে যথেষ্ট। ডি, আই, জি, খুশী হয়ে বললেন,

: দেশ মিলির কাছে কৃতজ্ঞ। তাকে পুরস্কৃত করা হবে। কানু (যার আসল নাম সমীর সেন) বললো,

: আমি নিজেই ওকে পুরস্কৃত করতে চেয়েছিলাম। ডি, আই, জি, বুঝলেন ব্যাপারটা। বললেন,

: তাতেই যদি মিলি খুশী হয়ে থাকে তবে আপত্তি নেই। সি, আই, ডিতে পাকা অফিসারের সাহায্যকারিনী। মন্দ কি ব্যাপারটা?

কথাটা বলেই প্রবীণ ঘাগু ডি, আই, জি, মশাই মুখ টিপে হাসে একটুখানি। মিলির চোখ কান মুখ লাল হয়ে ওঠে। মনে মনে সে স্রষ্টাকে বলতে চায়, তুমি যে কতো কাছে —নির্বোধ আমরা তা জানিনা—ডেকেই তোমার সারা ও সাহায্য পেলাম-সত্যিই তুমি আছো--তাহলে আমার বিনয়াবনত প্রমান গ্রহন করো।

এদিকে ডি, আই, জি, মশাইয়ের নির্দেশে মিলিকে কানুর বড়দার বাসায় তোলা হয়েছে। যেমনি কানু তেমনি তার বড়দা ও বৌদি! সমীর ওর বড়দার বাড়ীতে আসেনা বটে তবে টেলিফোনে মিলির সমস্ত খবরাখবরই নিয়ে থাকে। আজ বিকেলে সমীর টেলিফোন করতেই ওর বৌদি বললো,

: তুমিই একটু ধরোনা ভাই ফোনটা—আমি ততোক্ষণে তোমার দাদার চায়ের আয়োজন করি —ওর আবার ফিরবার সময় হলো।

মিলি শঙ্কিত হয়। বলে,

আমি ফোন ধরবো?

হ্যাঁ তুমি। ফোন ধরতে জানোনা নাকি? ভেবেছো আমি কিছুই শুনিনি? সমীর আমাকে সবই বলেছে—কতো বড়ো ঘরের মেয়ে তুমি, কিভাবে কি হলো তাও বলেছে। এমোন হয়—ভাগ্যে কখোন, কাকে কোথায় নিয়ে যাবে কে জানে।

: সমীরদা আর কি বলেছে?

: সবই বলেছে বুঝলে, সবই,! কবে পথের ধারে কিভাবে দাঁড়িয়ে থাকতো, ঘরের বউ করতে চেয়েছিল সবই বলেছে!

লজ্জায় মরে যাচ্ছিল তখোন মিলি! হেসে চিমটি কাটে,

: যাও বড্ডো ফাজিল তুমি! এসব কথা খুটিয়ে খুটিয়ে শুনতে আছে?

সমীর বললে আমি শুনবোনা কেনো? ও আমার কাছেই সব বলতো বহুদিন আগে থেকেই বলে এসেছে। যাওনা ভাই ফোনটা ধরো—তোমার খবর নিতেই ফোন করেছে—খামোখা পুলিশের মানুষ চটিয়ে লাভ নেই।

হ্যালো।

কে? মিলি?

বলছি—

আমার ভাগ্য—তোমার সঙ্গেই কথা বলার জন্য বৌদিকে ডাকছিলাম. সন্ধ্যের পরে একটু পার্কের ওখানে আসবে? মাত্র আধঘণ্টার জন্য, জরুরী কিছু কথা ছিল।

: ক'টায়?

: সাড়ে সাতটায়!

: আচ্ছা!

ফোন রেখে দেয় মিলি!

o o o o o

আধঘণ্টা কেটে গিয়ে আরো দুটো আধঘণ্টা চলে গেছে। রাত তখোন কাটায় কাটায় ন'টা। পার্কের নির্জন ঝোপের আড়ালে মিলির কোলে মাথা রেখে,সমীর প্রশ্ন করে.

তবে যে সেদিন না বললে?

: তোমাকে আমি ঠকাতে পারবো না সমু। তাই ওটা বলছি! বার বার ভেবেছি, কি আছে আমার যা নিয়ে আমি দেবতার পূজো করবো?

: পূজো, প্রতি আত্মীয়তার মূল কথা তো দেহ নয় মিলি! হৃদয়, হৃদয় সলীলের পবিত্র উৎসধারায় দেহের সমস্ত মলিনতা যে ধুয়ে মুছে যায়।

তাহলে তুমি আমাকে তোমার যোগ্য সংঙ্গিনী করে গড়ে নাও—

: আমার যোগ্য সংঙ্গিনী হিসেবে তোমার থেকে আর কে যোগ্যতা রাখতে পারে? কেনো ডি, আই, জি' মিঃ বোসের মন্তব্যটা মনে নাই?

তাহলে আগামী ২০শে ফাল্গুনই কথা ঠিক করি।

কিন্তু বৌদি—দাদা ওদের তো পছন্দ বলে!

হা হা করে হেসে উঠে বসে-আরে ওরা তো আমার মতোই তোমাকে

খুজে বেড়াচ্ছে বহুদিন থেকে !

: সবই বলেছো ওদের তাইনা ?

প্রশান্ত মহাসাগরের নীচেও প্রেম করলে লোকে তা জানে।

: তাই

হ্যাঁ।

শুধু দুঃখ !

: কিসের ?

শুধু জানতে পারলে না আমার মনের কথা।

: জানি গো জানি. সবই আমি জানি, বহুদিন থেকেই জানি !

: কি জানো বলো ?

এখোন নয়। পরে ?

বাসর রাতের মধু সজ্জায় ?

হু !

মিষ্টি করে ঠোঁট টিপে হাসে মিলি। এতো সুন্দর হাসি তার মুখে কখনো দ্যাখেনি সমীর। দু'হাত ধরে বুকের গভীরে টেনে নিয়ে বলে সে ফিস্‌ফিস্‌ করে,

কি সত্যি হলোতো আমার কথা ?

কি কথা।

আমার প্রেম সত্য হলে, তুমি আমার হবেই। মিলি বলে, সত্য প্রেম, সত্য বিশ্বাস কখনো পরাজিত হয় না। তাইনা।

হ্যা প্রেম, বিশ্বাস, ভক্তি, ভালোবাসা এগুলো চির অমর, অক্ষয়

পরের দিনও সমীরের সঙ্গে দেখা-করতে পার্কে যাচ্ছিল মিলি। হঠাৎ একটা এ্যামবাসাডার তার সামনে এসে ব্রেক কসল নির্জন রাস্তায়। রাস্তায় মিলি ছাড়া আর কেউ ছিল না। এক মেয়েলী কণ্ঠস্বর শুনে চমকে উঠে সে। আবার কোন বিপদ তার ঘটতে যচ্ছে নাতো ?

জানলা দিয়ে হাত গলিয়ে মেয়েটি মিলির কাঁদে হাত রেখে বলল, আমি তোমার ছোট বোন লিলি, আমাকে তুমি চিনতে পারছ না ? উঃ কতদিন পরে তোমার সঙ্গে আবার দেখা হল। প্রায় দশবছর হবে তাই না দিদি।

মিলি তাকাল। দু'হাত দিয়ে তার গলা জড়িয়ে ধরল।

ওহে লিলি। দুচোখ বেয়ে অঝোরে জল গড়িয়ে পড়তে লাগল তার।

লিলি গাড়ী থেকে নেমে দাঁড়িয়েছিল তাকে অনু সরন করল এক সুদর্শন যুবক। পরনে মূল্যবান সুট। লিলির স্বামী। এখানকার একটা কোলিয়ারির মালিক সে। সমাজে প্রতিষ্ঠিত যুবক।

লিলি তার স্বামী সুশোভন বোসের সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দিয়ে বলল, আমার দিদি মিলি। জীবনে অনেক দুঃখ সহ্য করেছে ও। আর নয়। এবার আমরা ওকে আমাদের বাড়ীতে নিয়ে যাব-চলো দিদি।

মিলি ওদের সঙ্গে গাড়ীতে উঠে বসল। বললো তার আগেপার্কে চলো

: কেন দিদি। সেখানে আবার কি? মিলি লিলির কানে কানে সব বললো। খুশীতে হেসে উঠলো লিলি। সুশোভন বোস বললো,

: আমি কিন্তু আনন্দ থেকে বাদ পড়ছি। লিলি স্বামীর কানে কানে কি বললো লিলি ও তার স্বামী হেসে উঠলো। মিলিও আর চুপ থাকতে পারলো না। হাসছে সেও। এতোদিনের হাসির বাঁধ ভেঙ্গেছে। প্রাণভরে হাসছে ওরা। মিলির হাসতে হাসতে চোখে অশ্রু নামে। আর সে আনন্দময় তার বিগত দিনের পাপ, তাপ, গ্লানি দুঃখ সব ধুয়ে মুছে দেয়। আনন্দ পবিত্রে ভরা ওরা সবাই।

পার্কে গেল ওরা। পরিচয় হলো সমীরের সঙ্গে। সমীরকে বললো মিলি, এই তার ছোট বোন যাকে সে খুঁজছিল এতদিন। সে রাত কেটে গেলো। আবার আর একটা ভোরহলো। একটা রাত্রির অবসান হল। সেই সঙ্গে বুঝি মিলির অন্ধকারময় জীবনেরও।

সমাপ্ত